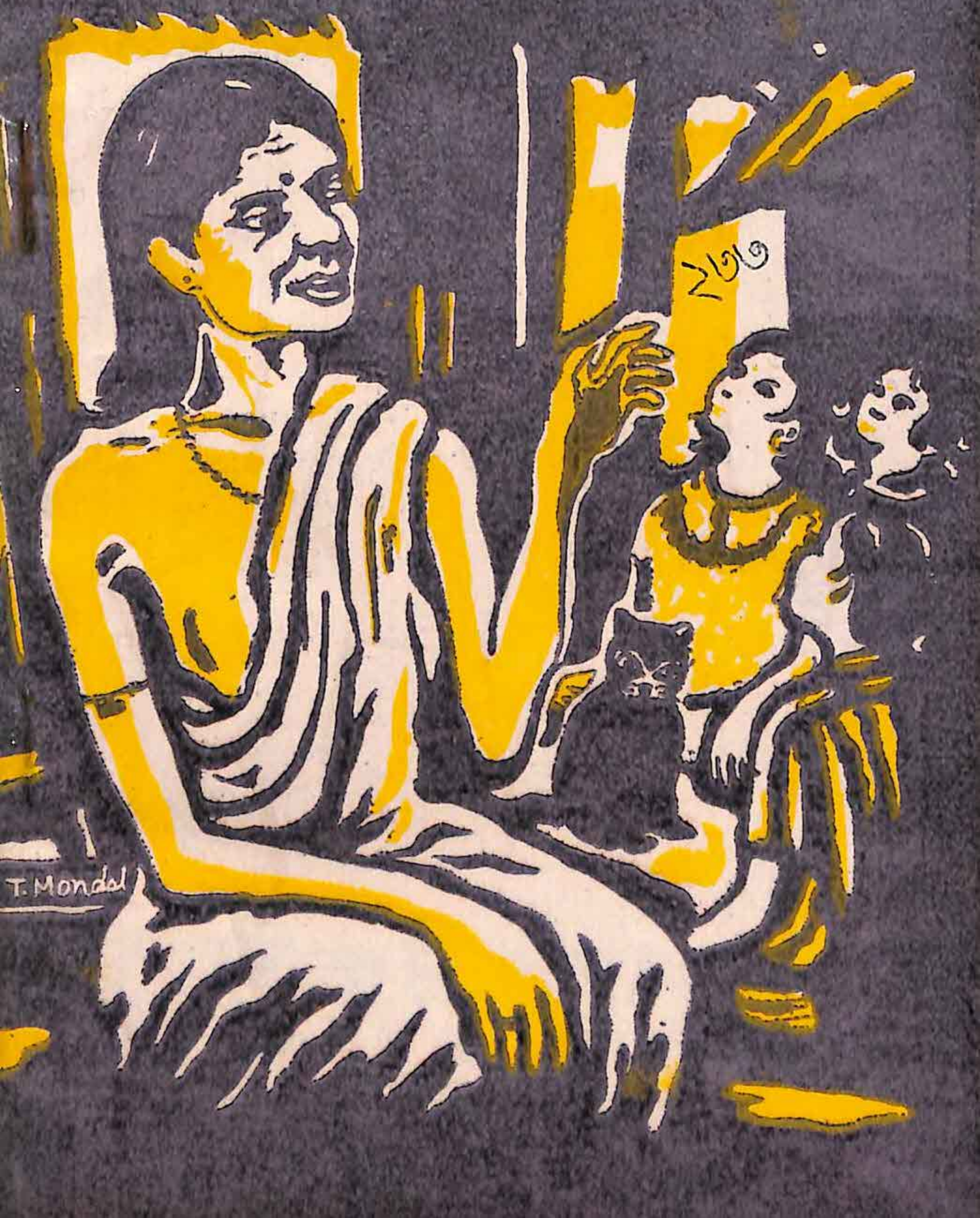
গপ্পো বলি শোনো





গপ্পো বলি শোন

শিশিরকুমার চক্রবর্তী এম. এ.
[রাষ্ট্রীয় সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক]

শিশু বিকাশ কেন্দ্র
৫৭-বি, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅলক মুখোপাধ্যায়
শিশু বিকাশ কেন্দ্র
১২১/সি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা মাত্র

চিত্রাঙ্কণে ঃ শ্রীভানু

মুদ্রক ঃ
শ্রীস্বপন কোলে
নিউ মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

ছোট্ট খোকা খুকুমণি-গপ্‌পো শুনতে চায়,
গপ্‌পো শুনতে তারা নাকি, ভারি ভালবাসে।
গপ্‌পো শোনার নামে সবাই, ভারি মজা পায়,
মজার মজার গপ্‌পো শুনে, খিল্‌খিলিয়ে হাসে।

এস তবে বস সবাই, গপ্‌পো বলি শোন,
গপ্‌পো বলতে জান আমি, বেজায় ভালবাসি।
গপ্‌পোগুলি শুনে মনে গপ্‌পেরই জাল বোন,
গপ্‌পো বলার মজুরি চাই, মিষ্টি মুখের হাসি।

ঃ এতে আছে ঃ

রাজা খায় বাদাম ভাজা,
এক যে ছিল রানী,
এক যে ছিল রাজপুত্তুর
এক যে ছিল রাজকন্যে
ডানা কাটা পরি
রাজা হল বনমানুষ
শেয়াল সিংহী রাজা
যেমন বাদশা তেমনি বেগম

রাজা খায় বাদাম ভাজা

এক যে ছিল রাজা। গায়ে তাঁর ঝলমলে নানান রঙের পোশাক। মাথায় তার সাতরাজার ধন মানিক বসান মুকুট। গলায় গজমোতির মালা। দু'হাতে হীরের ফুল বসানো সোনার বালা। পাঁচ আঙুলে মণি-মুক্তো-চুনি-পান্না-পোখরাজ বসানো আংটি।



রাজামশাই সিংহাসনে বসে আছেন

পায়ে জরির কাজ করা শুঁড় তোলা নাগরা জুতো। কোমরে তার খাপে ভরা ঝক্‌ঝকে তলোয়ার। নাকের নীচে এক বিরাট গোঁফ। ওঃ! সে যা রাজা না! সে আর কি বলব।

রাজামশাই সিংহাসনে বসে আছেন। পাত্র-মিত্র-মন্ত্রী, সেনাপতি, কোটাল, ঘাটোয়াল, পাটোয়ার সবাই হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। রাজামশাই হুকুম করলেই সবাই বলবে, জোহুকুম। তা সবাই দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে। রাজামশাই হুকুম আর করেন না।

বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যে হয় হয়। তখন মন্ত্রী কাঁপতে কাঁপতে বলল—মহারাজ ভয়ে বলি, না নির্ভয়ে বলি। হুকুম দেন তো ঘরকে চলি।

তাই না শুনে রাজামশাই মেঘের মত ডাক ছেড়ে বললেন—বাদাম ভাজা! বাদাম ভাজা। কচর মচর টাটকা তাজা।

তখন পাত্র তাকায় মিত্রর দিকে; মিত্র তাকায় মন্ত্রীর দিকে; মন্ত্রী তাকায় সেনাপতির দিকে; সেনাপতি তাকায় কোটালের দিকে; কোটাল তাকায় ঘাটোয়ালের দিকে।

ঘাটোয়াল এক ছুটে রাজসভা থেকে বেরিয়ে গেল। রাজবাড়ীর সিংহ দরজায় ছিল তুরী, ভেরী, জয়ঢাক, রামশিঙা, ঢাক, ঢোল, কারাদগড়, জগঝম্প। ঘাটোয়াল হাঁপাতে হাঁপাতে বাজনদারদের বলল,

রাজা খাবে বাদাম ভাজা।
বাজারে বাজনা বাজা॥

অমনি ঢাক, ঢোল, কারাদগড়, রামশিঙা, তুরী, ভেরী, জগঝম্প বেজে উঠল। সেই বাজনা শুনে দলে দলে

লোকজন রাজবাড়ির সিংহ দরজার সামনে ছুটে এল। বাজনার তালে তালে নাচতে নাচতে তারা বলল,

বাজনা বাজাও খাজনা নাও।
বাদাম ভাজা টাট্‌কা খাও ॥

তাই না শুনে রাজামশাই সিংহাসন থেকে নেমে এলেন। বললেন—কই! কোথায়, চাই চানাচুর বাদাম ভাজা।

বাদামভাজাওলা এগিয়ে এসে পেন্নাম করে বলল,

জয় হক, রাজামশায়ের।
বাদাম ভাজা, রয়েছে ঢের ॥

রাজামশায় হাসতে হাসতে বললেন—দাও দেখি এক



বাদামভাজাওয়ালা রাজাকে বাদাম দিল

ঠোঙা। তার সঙ্গে এক পুরিয়া নুন ঝাল-মসলা দিও বাপু।

বাদামভাজাওলা তো এক ঠোঙা বাদাম আর এক পুরিয়া ঝাল-মসলা রাজামশায়ের হাতে তুলে দিলেন। রাজামশায় বেজায় খুশী। মন্ত্রী খোসা ছাড়িয়ে দেয়। রাজামশায় ঝাল-মসলা টাথ্‌না দিয়ে খান আর বলেন—

খাসারে খাসা। মিটল মনের আশা ॥

বাদামভাজাওলা তখন হাত পেতে বলে—মহারাজ তাহলে আমার বখ্‌শিসটা !

রাজামশাই জিভ কেটে বললেন—ইস্‌। বিচ্ছিরি ভুল হয়ে গেছে। তা—

বল তুই চাস্‌ কি ? রাজ্য চাস্‌ তো রাজ্য দি।

বাদামভাজাওলা তাড়াতাড়ি হাতজোড় করে বলল—

বাপরে বাপ করুন মাপ।

আমার রাজা হওয়ার সখ নেই মহারাজ। আপনি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একদিন বিনি পয়সার বাদাম ভাজার ভোজ দিন। আমি তাতেই খুশী।

রাজামশাই বললেন, তাই হবে। যত বাদাম লাগবে সব তুমি দেবে। আর—

দাম পাবে নগদা-নগদ।
আমার হুকুম কে করে রদ ॥

তারপর দিন রাজ্যে ঢেড়া পিটিয়ে দেওয়া হল। যত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে রাজবাড়ীর সামনে এসে জড়

হল। সে কি মাতামাতি! নাচানাচি! হাসাহাসি! ঠেলাঠেলি-হৈ-হুল্লোড়।

রাজামশাই সবাইকে এক ঠোঙা করে বাদাম ভাজা দিলেন। সবাই চেঁচিয়ে উঠল—রাজামশায়ের জয় হোক।

হাসতে হাসতে, নাচতে নাচতে, গাইতে গাইতে বাদাম ভাজা খেতে খেতে যে যার বাড়ী চলে গেল। বাদামভাজাওলা বাদামের দাম নগদ পেল। সে অনেক টাকা। সেই টাকা দিয়ে সে ঘরবাড়ি জমিজায়গা কিনল। তাকে আর বাদাম বেচতে হয় না।

এক যে ছিল রানী

এক যে ছিল রানী। রানী ভারি রূপসী। পানপাতার মত মুখ। টানাটানা দুটি চোখ। তিল ফুলের মত টিকালো নাক। চাঁপাফুলের কলির মত হাতের আঙুল। দুধে-আল্তায় গোলা গায়ের রঙ। একমাথা কোঁকড়ান কালবরণ চুল। আপেলের মত লাল টুক্টুকে ঠোঁট।

রানী কথা বললে যেন জলতরঙ্গের বাজনা বেজে ওঠে টুং-টাং! টুং-টাং। রানী হাসলে যেন মুক্তো ঝরে। রানী কাঁদলে যেন······তা রানী কাঁদেই না।

রানী একদিন স্নান করে ধূপের ধোঁয়ায় চুল শুকোচ্ছে। সেই সময় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল এক ফিরিওলা।



রূপসী রানী

চাই বাস তেল কুম্‌কুম আয়না।
কেউ চায় কেউ চেয়েও পায় না॥

রানী অমনি তাই-না শুনে দাসীকে ডেকে বলল,

ওরে-ও-দাসী ; মতীর মাসী।
শুনে আমার পাচ্ছে হাসি॥
ওকে ডেকে নিয়ে আয় না।
দেখি ওর কেমন আয়না॥

দাসী ছুটতে ছুটতে গিয়ে ফিরিওয়ালাকে ডেকে নিয়ে এল। ফিরিওয়ালা এসে রানীমাকে পেন্নাম করে বলল, রানীমার জয় হোক।

রানীমা বলল, তা দেখি বাছা তোমার আয়না দেখাও।

ফিরিওয়ালা ঝাঁকা থেকে আয়না বের করে রানীমাকে দেখায়। বা-রে কি সুন্দর আয়না!

রূপোর পাতে, সোনার ফুলের ঝিলিমিলি।
আয়না দেখে, রানী হাসেন খিলিখিলি॥

রানী বলে, এই আয়না আমার চাই-ই চাই। আয়নার দাম কত?

ফিরিওলা বলে, সোনার টাকা পাঁচ কি ছয়।

রানী বলল, আয়নার দাম এত কি হয়! তোমার আয়নার গুণটি কি?

ফিরিওলা বলে, শুনুন তবে, বলেই দি। রোজ সকালে চান করে, কাপড় ছেড়ে, চাঁদ কপালে টিপ পড়ে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলবেন ঃ

আয়না আমার আয়না!
আমার মত রূপসী কে?
তাকে নিয়ে আয় না।

শুনে রানী অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে বলে ওঠে ঃ ওমা! আমার মত সুন্দরী কেউ আছে নাকি।

ফিরিওলা বলল—

না থাকে তো নেই।
থাকলে পরে আয়নাতে তার
মুখ ভেসে উঠবেই।

রানী বলল, তাই নাকি! তাহলে রেখে যাও

তোমার আয়না। ওরে ও দাসী মতির মা। আয়নার দাম দিয়ে যা।

মতির মা ফেরিওলার হাতে ছটি সোনার টাকা গুনে দিল। টাকা ট্যাঁকে গুঁজে ফেরিওলা হাসতে হাসতে রাজবাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

পরদিন ভোর না হতেই রানী বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। রাজবাড়ির অন্দর মহলেই রূপসাগর। রূপসাগরের জলে রানী স্নান করল সাত-সকালে। তারপর কাপড় ছেড়ে, চুল আঁচড়ে, কপালে কুম্‌কুমের টিপ পরে, শিব ঠাকুরকে পেন্নাম করে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলল,

আয় না রে আয়না।
আমার মত রূপসী কে ?
তাকে নিয়ে আয় না।

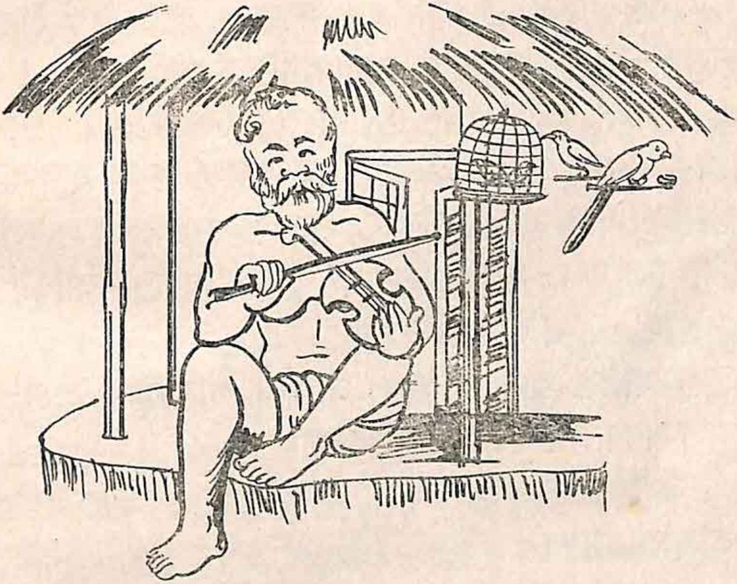
ওমা! যেই না একথা বলা, অমনি আয়নায় আধ ঘোমটা দেওয়া লাজুক লাজুক একটা মুখ ভেসে উঠল। সে মুখে যেন হাসি উপচে পড়ছে; সে দুটি চোখে যেন মায়া মাখানো। তার ছোট্ট কপালে একটা লাল টক্‌টকে সিঁদুরের টিপ। তার পরনে বুটিদার ঢাকাই শাড়ি।

ভয়ে রানীর বুক টিপ্‌টিপ করে উঠল। ওমা! তার মত কি? ও যে তার চেয়েও সুন্দরী। হায় হায়। তার রূপের দেমাক বুঝি এতদিনে ঘুচে গেল।

রানীর খেয়ে সুখ নেই। ঘুমিয়ে শান্তি নেই। মন হু হু করে। কথা বলতে গেলে চোখ ছলছলিয়ে ওঠে।

রাজামশাই দেখেশুনে বলেন, কি হয়েছে গো রানী। কিসের দুঃখ বল তো শুনি।

রানী তো সব কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিল। রাজামশাই বললেন—এই কথা। দাঁড়াও। এখুনি আমি চাঁইবুড়ো পান্তকুটুলকে ডেকে পাঠাচ্ছি।



চাঁইবুড়ো পান্তকুটুল

নদীর ধারে, বটগাছের ছায়ায় পান্তকুটুলের পাতায় ছাওয়া ছোট্ট কুঁড়েঘর। রাঙচিতের বেড়ায় ঘেরা উঠোন। উঠোনে টগর, দোপাটি, অপরাজিতা, বেল, যুঁই, কাঁঠালি চাপা—কত কি রকমারি ফুলের মালা। বারান্দার খুঁটিতে বাঁধা বাঁশের আলনায় টাঙানো ময়না,

টিয়া, দোয়েল, কোয়েল, দুর্গা টুনটুনি। উঠানের দরজার সামনে কেলো ভুলো দুটি কুকুর শুয়ে। বারান্দার এককোণে মেনি বিড়াল মিউমিউ করছে। উঠানের একপাশের আটচালার গোয়াল ঘরে বুধী গাই। কৈলে বাছুরের গা চাটছে। পান্তুবুটুল উদোম গায়ে দাওয়ায় বসে। হাতে তার বেয়ালা: সা-রে-গা-মা-মা। গা-মা-পা ধানি।

রাজবাড়ির পেয়াদা নাছ দরজায় লাঠি ঠুকে হাঁক ছাড়ল—পান্তুবুটুল হো। বলি বাড়িতে আছ হে!

কেলো ভুলো ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল। টিয়া ট্যাঁ ট্যাঁ করে ডেকে উঠল। ঝট-পটাপট ডানা ঝাপটে, কিচিরমিচির করে ডাকতে লাগল—দোয়েল, কোয়েল, দুর্গা টুনটুন। ময়না শিস্ দিয়ে গান ধরল—বাড়িতে আছ হো! বাড়িতে আছ হো!

কোলের বেয়ালা কোলে নামিয়ে পান্তুবুটুল বলে—সাত সকালে কে ডাকাডাকি করে?

রাজপেয়াদা বলে—আমি রাজপেয়াদা। রাজামশাই বোলাতা হ্যায়।

পান্তুবুটুল বলে, কেন?

রাজপেয়াদা বলে—আমি তার কি জানে বাবা। শুনেছি, রানী মাইজির গোঁসা হয়েছে।

পান্তুবুটুল হাসতে হাসতে বলল, তা চল বাবা। পেয়াদা বাবা। রাজামশাই যখন ডেকেছেন, তখন কি না গিয়ে থাকতে পারি।

গোঁফ চুমড়ে রাজপেয়াদা বলল, জল্‌দি করনা চাহিয়ে।

চার ঘোড়ায় টানা গাড়ি চেপে রাজপেয়াদার সঙ্গে পাত্তকুটুল রাজবাড়িতে গিয়ে হাজির হল। সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেল অন্দরমহলে। মোতির মা দাসী এসে আদর করে ডেকে নিয়ে গেল পাত্তকুটুলকে।

রাজামশাই বললেন ও পাত্তকুটুল! এ তো ভাল বিপদ হল দেখছি। রাজরানীর প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

পাত্তকুটুল তাড়াতাড়ি বলল—কেন কেন?

রাজামশাই মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন—শোন তাহলে, সব কথা খুলেই বলি। এই না বলে রাজামশাই সেই আয়নার কথা; তারপরের কথা; তারপরের কথা; সব খুলে বলল পাত্তকুটুলকে।

সব শুনে পাত্তকুটুল বলে—ডেকে আনুন রানীমাকে; আনতে বলুন আয়না। নিজের চোখে না দেখলে, কিছুই বলা যায় না।

তারপর ঝমর ঝমর নূপুর পায়ে, হীরে-মোতির গয়না গায়ে, রানী এসে দাঁড়াল। হাতে তার সেই আয়না। পাত্তকুটুল বলল, রানীমা। আয়নায় মুখ দেখে রানী যেই বলেছে ঃ

আয় না রে আয়না।
আমার মত রূপসী কে
তাকে নিয়ে আয় না।

অমনি আয়নায় রানীমার মুখের পাশে একটি টলটলে

রূপসীর মুখ ভেসে উঠল। তাই না দেখে পান্তকুটুল একগাল হেসে বলল, বুঝেছি বুঝেছি।

রাজামশাই তাড়াতাড়ি বললেন—কি বুঝেছ পান্তকুটুল।

পান্তকুটুল নিজের সাদা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল—রানীমাকে মা-রূপসী হতে হবে। কোল আলো করা রাজপুত্তুর-রাজকন্যে চাই। তারপর রানীমাকে আয়না সুন্দরীর চাইতেও শতগুণে সুন্দরী দেখাবে।

সে কথা-না শুনে রানী লজ্জায় ঘোমটা টেনে মুখ ঘুরিয়ে নিল। রাজামশাই হাসতে হাসতে বললেন—বাঁচালে তুমি পান্তকুটুল।

এক যে ছিল রাজপুত্তুর

এক যে ছিল রাজপুত্তুর। তার নাম স্বপনকুমার।

স্বপনকুমার রাজা-রানীর নয়নের মণি। চোখের আড়াল হলেই, কোথায় গেল, কোথায় গেল, হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি শুরু করে দেন। খোঁজ খোঁজ করে দাস-দাসীরা ছোটাছুটি লাগিয়ে দেন। তাই-না দেখে স্বপনকুমার ভারি মজা পায়। স্বপনকুমার ভারি মিষ্টি-দুষ্টু কিনা! তাই সবাই যখন তাকে খুঁজে বেড়ায় সে

তখন চুপটি করে লুকিয়ে থাকে। তারপর খুঁজতে খুঁজতে সবাই যখন হয়রান হয়ে যায়, কোথায় আমার নয়নমণি, কোথায় গেলি বাছা। আয় রে ছুটে দেখা দে রে, আমাকে তুই বাঁচা! বলে রানী কাঁদতে বসেন—তখন আড়াল থেকে মিষ্টি স্বরে সে 'কু' দিয়ে ওঠে—কু! কু! রানী তখন ছুটে গিয়ে স্বপনকুমারকে খুঁজে বের করে,



স্বপনকুমার চুপটি করে লুকিয়ে থাকে

বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, ওরে দুষ্টু! ওরে দুষ্টু। স্বপনকুমার খিল খিল করে হাসে আর বলে, ঠকিয়েছি। ঠকিয়েছি। মামণিকে কাঁদিয়েছি। রানীর তখন মুখে হাসি, চোখে কান্না, হীরে মানিক চুনি পান্না।

একদিন হল কি রানীর খুব অসুখ করল। রানী দিন রাত বিছানায় শুয়ে থাকে। সোনার অঙ্গ কালি হয়ে যায়। দাসীরা রূপোর থালায় সোনার বাটিতে মিছরি, মাখন, ডাবের জল, চিনির পানা, লেবুর রস, আঙুর, আপেল, বাদাম, আখরোট, কত কি নিয়ে আসে। রানী সে দিকে ফিরেও তাকায় না। কখনও বা একটু-আধটু মুখে দিয়ে থু-থু করে ফেলে দেয়। দাসীরা রানীর সারা গায়ে চন্দন মাখিয়ে দেয়; একশ দাসী সোনার হাতল দেওয়া চামর নিয়ে দিন রাত হাওয়া করে। তবু রানীর সারা গা জ্বালা করে। রাতের বেলা শোয়ার সময় সখিরা মধুঝরা সুরে গান গায়। জলতরঙ্গের বাজনা বাজায়। তবু রানীর চোখে ঘুম নেই।

দিনে দিনে রানী শুকিয়ে যায়। দু' চোখের কোণে কালি পড়ে। রাজামশাই ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েন। রাজকবিরাজকে ডেকে বলেন—ভাল ভাল জরি-বুটি-সালসা-পাচন তৈরী করে রানীকে ভাল করে তোল তাড়াতাড়ি। নইলে তোমার গর্দান যাবে।

রাজকবিরাজ হাসতে হাসতে বলে—আমার গর্দান যায় যাবে। কিন্তু রানীমাকে কি বাঁচাতে পারবেন মহারাজ। বরং আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি।

রাজামশাই তখন রাজকবিরাজের দু'হাত জড়িয়ে ধরে বলে, তবে তুমি তাই কর রাজকবিরাজ। বল তোমার কি চাই?

রাজকবিরাজ বলল, সে বড় কঠিন জিনিস মহারাজ। বাঘের দুধ চাই। নিজের হাতে দুয়ে আনতে হবে।

রাজামশাইয়ের মাথায় যেন বাজ পড়ল। বাঘের দুধ! কোথায় আছে দুধ্‌লো বাঘ। সে দুধ দুয়ে আনবে কে?

রাজকবিরাজ বলল, যেমন করেই হোক সাতদিনের মধ্যে সাত ফোঁটা বাঘের দুধ চাই। তারপর যদি রানীমাকে বাঁচাতে না পারি; তখন আমাকে যে শাস্তি দেবেন, আমি তাই'ই মাথা পেতে নেব।

কে আনবে বাঘের দুধ? যে আনতে পারবে, তাকেই আমি আধ্যেক রাজত্ব দান করব। কে আছ বীর আমার রাজ্যে, আমার রাজসভায়? পাহাড়-জঙ্গল, সোঁদরবন, হেতালবন, কাজিডাঙা, মাথাভাঙ্গার এ-বন ও-বন—যেখান থেকে পাও নিয়ে এস বাঘের দুধ। বেশী নয়, মাত্র সাত ফোঁটা।

মন্ত্রী, সেনাপতি, পাত্র-মিত্র, কোটাল-ঘাটোয়াল সবাই মাথা হেঁট করে বসে থাকে। মুখ তুলে কারও কথা বলার সাহস নেই।

রাজামশাই আবার বললেন, কথায় বলে, কড়িতে বাঘের দুধ মেলে। তা কত কাহন কড়ি চাই? রাজকোষে যত সোনা-রূপো মণি-মাণিক্য আছে যা নিতে চাও সব নাও। হাতী, ঘোড়া. লোকলস্কর, সৈন্য-সামন্ত,

যত ইচ্ছা নিয়ে যাও। শুধু সাতদিনের মধ্যে এনে দাও, সাত ফোঁটা বাঘের দুধ।

রাজসভা চুপচাপ। ছুঁচ পড়লে শব্দ শোনা যায়। —তবে কি রানী বাঁচবে না। হায় ভগবান। ঝরঝর করে রাজা কেঁদে ফেললেন।

এমন সময় স্বপনকুমার রাজসভায় এসে ঢুকল। রাজাকে কাঁদতে দেখে বলল ঃ

চোখের জল ফেলে কেন
কাঁদছ অকারণ।
বাঘের দুধ আনব আমি
এই করিনু পণ॥

রাজামশাই বললেন—না বাবা! তোকে যেতে হবে না বাঘের দুধ আনতে। আমিই যাব। দেখি, বাঘের দুধ মেলে কি না মেলে।

স্বপনকুমার বলল, তুমি গেলে কে করবে রাজ্য-শাসন, প্রজাপালন। অনুমতি দাও বাবা। আমিই বাঘের দুধ আনতে যাই।

রাজা তখন বললেন, তবে তাই হোক। এই নাও আমার তলোয়ার। আর নিয়ে যাও সঙ্গে করে, আমার এই ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুলের অভয় আংটি। যাওয়ার আগে মায়ের সঙ্গে দেখা করে যেও। কিন্তু বলো না যেন—কোথায় যাচ্ছ, কেন যাচ্ছ, যাচ্ছ তুমি কত দূরে।

কাল ঘোড়ার পিঠে চড়ে স্বপনকুমার চলেছে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে। মাথায় লাল পাগ্ড়ী।

কোমরে খাপে ভরা বাঁকা তলোয়ার। গায়ে লোহার বর্ম। ডান হাতের তর্জনীতে মহারাজের নিজের হাতে পরিয়ে দেওয়া অভয় আংটি। এ আংটি যার হাতে থাকে —সে পশুপাখীর ভাষা বুঝতে পারে। তার কোনও বিপদ ঘটে না পথে-ঘাটে।

তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে অরণ্য-বীজ বন। বনের ভিতরে ঢুকতেই, ঘোড়াটি সামনের দু'পা তুলে ডেকে উঠল—চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ। স্বপনকুমার স্পষ্ট বুঝল—তার ঘোড়া কালাপাহাড় কি বলছে—থাম স্বপনকুমার এবার থাম। গভীর বন। ওই দেখ; সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এল। এবার না থামলে পথ হারিয়ে ফেলবে রাতের আঁধারে।

স্বপনকুমার নেমে পড়ল ঘোড়ার পিঠ থেকে। কাছেই ছিল বনদীঘি। দীঘির ঘাটে নেমে স্বপনকুমার দু'হাতের আঁচল ভরে জল খেল। জল খাওয়াল কালপাহাড়কে। পেটিকা থেকে দানার থলি বের করে, কালাপাহাড়ের মুখের সামনে তুলে ধরল। শুক্‌নো দানা নিজেও কিছু খেল স্বপনকুমার। তারপর দীঘির ধারে বটগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে ভাবতে লাগল আকাশ-পাতাল।

কালাপাহাড় চুপ্‌চাপ শুয়েছিল, স্বপনকুমারের পাশটিতে। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে স্বপনকুমারের চারপাশে ঘুরপাক খেতে খেতে চিঁ-হি, চিঁ-হি করে ডেকে

উঠল। স্বপনকুমার স্পষ্ট বুঝতে পারল, কালাপাহাড় বলছে—

আগুন জ্বালো স্বপনকুমার,
বাঘ-ভাল্লুক কাছে তোমার
ঘেঁষবে নাক ; রেহাই পাবে।
মায়ের কোলে ফিরে যাবে॥

স্বপনকুমার তাই না শুনে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল। পেটিকা থেকে চক্‌মকি পাথর বের করে ঠুকে ঠুকে আগুন জ্বালাল। শুক্‌নো কাঠ-কুটো জড় করে চারপাশে গোল করে সাজিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল তাতে। সেই বেড়া-আগুনের গণ্ডীর ঠিক মাঝখানে কালপাহাড় গিয়ে দাঁড়াল। তার ঠিক বুকের তলায় খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে বসে রইল স্বপনকুমার।

রাত ভোর হল। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে লাগল। পাখিসব কলরব করতে করতে বাসা ছেড়ে ডানা মেলে দিল নীল আকাশে। ঘুম ভেঙ্গে গেল স্বপনকুমারের। দাঁত মেজে, দীঘির জলে চোখ-মুখ ধুয়ে, আঁচলা ভরে দীঘির ঠাণ্ডা জল খেয়ে ডাক ছেড়ে বলে উঠল—আঃ!

এমন সময় হৈ-হৈ করতে করতে একদল বুনো লোক সেখানে এসে জুটল। বেশ মোটাসোটা, নিকষ-কাল শরীর। মাথায় কাল কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। হাতে তাদের তীর-ধনুক-বর্শা। ভোর না হতেই তারা বেরিয়েছিল শিকার করতে। তারা তো

স্বপনকুমারকে দেখে অবাক। বুনোদের সর্দার স্বপনকুমারকে বলল—তু কে বটিসরে। কুথাকার রাজার বেটা রাজপুত্তুর বটিস রে তুই!

স্বপনকুমার তখন বুনোদের সর্দারকে সব কথা খুলে বলল। বলতে গিয়ে মায়ের রোগে-শুক্‌নো মুখটি চোখের সামনে ভেসে উঠল তার। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল স্বপনকুমার।

বুনোদের সর্দার আহা আহা করে বলে উঠল—কাঁদিসনি বেটা, কাঁদিসনি। আমি তুকে বাঘের দুধ এনে দিবেক।

বুনোদের সর্দার স্বপনকুমারকে তাদের ডেরায় নিয়ে গেল। স্বপনকুমার তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি করে বাঘের দুধ যোগাড় করবে বুনো বাবা?

বুনোদের সর্দার বলল—সে তুই দেখিস না কেনে।

সর্দারের হুকুমে বুনোরা বনের এদিকে-ওদিকে ছুটে বেড়াতে লাগল—দুধ্‌লো বাঘের খোঁজে। বনের ঈশান কোণে ছিল ছোট্ট একটা টিলা পাহাড়। পাহাড়ের নাম—মারুতি। মারুতি পাহাড়ের গুহায় থাকত এক বাঘিনী। কিছুদিন হল, মা হয়েছে বাঘিনী। গুহা ছেড়ে বাঘিনী তাই বেশী দূর যায় না। ধারে কাছেই ঘোরাঘুরি করে; আর ছানাকে আগল দিতে শুয়ে থাকে গুহার ভিতরে।

দুধ্‌লো বাঘের খোঁজে একদল বুনো গিয়েছিল

মারুতি পাহাড়ে। পাহাড়ের গুহায় বাঘিনী আর তার ছানাকে দেখে, তারা ছুট্তে ছুট্তে খবর দিল সর্দারকে ঃ

সর্দার। সর্দার।
খবর আছে জোরদার ॥
পাহাড়-গুহায় বাঘিনী।
এমনটি তো ভাবিনী ॥

তাই না শুনে সর্দার চেঁচিয়ে উঠল—হাঁকো-পাঁকো! হাঁকো-পাঁকো। স্বপনকুমারকে ডাকো! স্বপনকুমারকে ডাকো!

বুনো সর্দার আর বুনোরা স্বপনকুমারকে নিয়ে তখনই চলে গেল মারুতি পাহাড়ে। গুহার কাছাকাছি বিরাট এক বটগাছের এ ডালে সে ডালে উঠে গিয়ে বসল সবাই। এক বুনোর হাতে ছিল শক্ত বুনো লতায় পাকানো মস্ত বড় এক দড়ির ফাঁস সর্দারের হাতে ছিল লম্বা বাঁশের লগা। লগার ডগায় একরকম শুক্নো পাতার গোছা; শক্ত করে বাঁধা। গাছে উঠে স্বপনকুমার মাথার পাগড়ি খুলে, গাছের ডালের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেলল, সর্দারের কথামত। বাঁশের চোঙাভর্তি একরকম চট্‌পটে তরল আঠা নিয়ে গিয়ে ছিল বুনোরা। সেই আঠা তারা ওপর থেকে ঢেলে দিল গাছের চারপাশে, শুক্নো পাতার ওপরে। তারপর সর্দার ইসারা করতেই—বুনোরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল হা-রে-রে-রে-রে! আ-বা-বা-বা-বা-বা। তাই না শুনে গুহার ভিতর থেকে হাঁকোড়-হাঁকোড় ডাক ছাড়তে ছাড়তে

বাঘিনী ছুটে বেরিয়ে এল। বটগাছের গোড়ায় যেতে না যেতে চার থাবা আঠায় মাখামাখি। রেগে গিয়ে গায়ে মাথায় থাবা ঘসে আঠা ছাড়াবার চেষ্টা করল বাঘিনী। আঠা তো ছাড়লই না। তার উপরি হল কি, আঠা-লাগা পাতা ছু' চোখে আটকে যাওয়ায় বাঘিনী তখন কানা। সেই সুযোগে বুনোটা বাঘিনীর গলায় লতার ফাঁস পরিয়ে দিল। ফাঁসের একদিক বটগাছের মোটা ডালের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা ছিল। বাঘিনী যত লাফায় ফাঁস তত শক্ত হয়। রেগেমেগে লাফাতে লাফাতে, গাঁক গাঁক করে ডাক ছাড়তে ছাড়তে এক সময়ে বাঘিনী নিঃস্তেজ হয়ে পড়ল।

বুনোদের সর্দার তখন বটগাছ থেকে নেমে এল। তার হাতের লগায় বাঁধা শুকনো পাতার গোছায় আগুন ধরিয়ে দিল। পাতার গোছা যত জ্বলে, তত ধোঁওয়া হয়। ধোঁওয়া থেকে মিষ্টি গন্ধ ছড়ায়। সর্দার তখন দূর থেকে লগাটি বাঘিনীর নাকের ডগার সামনে ধরে ঘোরাতে লাগল।

ধোঁওয়ার মিষ্টি গন্ধে বাঘিনীর ছু' চোখে ঘুম নেমে এল। গভীর ঘুম। আস্তে আস্তে বুনোরা গাছ থেকে নেমে এল একে একে। গায়ের বাঁধন খুলে স্বপনকুমারও গাছ থেকে নেমে পড়ল। এক বুনো বটপাতায় সুন্দর ঠোঙা তৈরী করে স্বপনকুমারের হাতে দিল। সর্দার স্বপনকুমারকে বলল—যা বেটা! ছুধ ছুহে নিয়ে আয়!

বাঁট টিপে টিপে সাত ফোঁটা ছুধ ছুইল স্বপনকুমার।

তার একটুও ভয় করেনি। হাজার হোক, রাজার বেটা তো।

বুনোরা বাঘিনীটাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল।



সাত ফোঁটা দুধ দুইল স্বপনকুমার

স্বপনকুমার বলল, না। ওকে মেরে ফেললে, ওর বাচ্চাও যে মরে যাবে। মায়ের মঙ্গলের জন্য আমি বাঘের দুধের খোঁজে বেরিয়েছি। ওকে মেরে ফেললে যদি অকল্যাণ হয়। যদি আমার মায়ের অসুখ না সারে।

স্বপনকুমারের কথা শুনে, ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে সর্দার বলল—ঠিক ঠিক। তখন স্বপনকুমার বলল, তাহলে কেউ ওর গলা থেকে ফাঁসটা খুলে নিক।

একজন বুনো তাড়াতাড়ি গিয়ে বাঘিনীর গলা থেকে ফাঁসটা খুলে নিল। সর্দার সবাইকে ডেকে

বলল—চল সবাই এখান থেকে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় এখুনি ওর ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

তারপর কি হল! রূপোর কোটা করে সেই দুধ নিয়ে স্বপনকুমার ফিরে এল রাজপুরীতে। রাজামশাই আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরল স্বপনকুমারকে। রাজ-কবিরাজ সেই দুধ দিয়ে ওষুধ তৈরী করে মহারাণীকে খাইয়ে দিলেন। রাণীর অসুখ ভাল হয়ে গেল। সব শুনে রাণী স্বপনকুমারকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে খেতে আদর করতে করতে বলল—

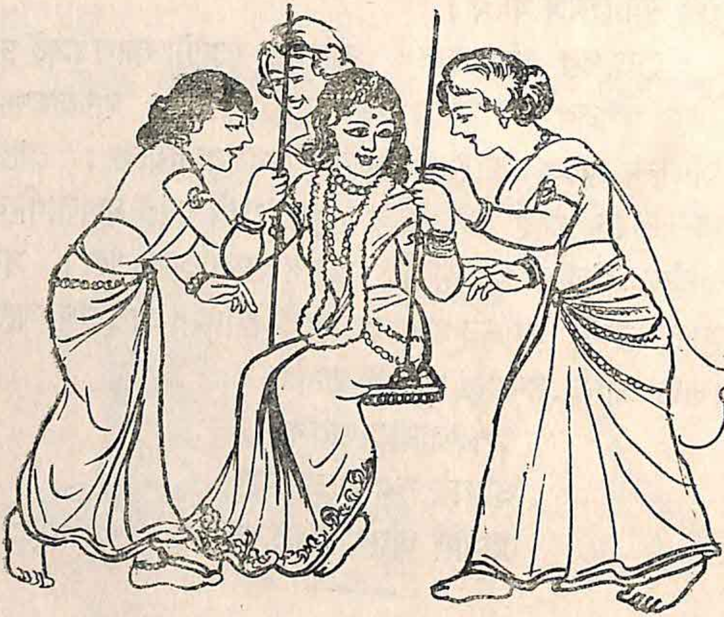
স্বপনকুমার ভাগ্যি ছিল
বাঘের দুধ এনে দিল
আমার অসুখ সেরে গেল।

এক যে ছিল রাজকন্যে

এক যে ছিল রাজকন্যে। রাজকন্যের যেমন রূপ, তেমনি গুণ, তেমনি চুল। নাম তার রূপবতী।

রূপবতী রাজকন্যের রূপের ভারি দেমাক। রূপের দেমাকে রূপবতী কথা বলে না কারও সঙ্গে। তার সখিরাও সব রূপসী। রূপসী সখিদের সঙ্গে রূপবতী কানামাছি খেলে; দোল-দুলুনি দোলে। রূপসায়রের

জলে সাঁতার কাটে। কখনও বা ফুল বাগানে



দোল-দুলু্লি দোলে রূপবতী

বেড়াতে বেড়াতে সখিদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে মিষ্টি গলায় গান গায়—

রাজকুমারী, রাজার মেয়ে
রূপবতী সই
স্বপ্নে দেখা রাজারকুমার
কই গো এল কই।

সখিরা মুচকি হেসে বলে—আসবে। আসবে। ঘোড়ায় চেপে টগবগিয়ে, গলায় গজমোতির হার দুলিয়ে আসবেই আসবে—সেই অচিনপুরীর অচিনকুমার।

রূপবতী ঠোঁট উলটিয়ে বলে, এল না-এল, আমার ভারি বয়েই গেল।

সখিরা বলে—তাই না-কি লো! তাই নাকি। তবে কি তুই বিয়ে করবি না।

রূপবতী বলে—

মনের মত বর চাই।
বাজবে তবে বিয়ের সানাই॥

দিন যায়। দেখতে দেখতে রাজকুমারী বড় হয়ে উঠল। রাণীর চোখে ঘুম নেই। রাজাকে ডেকে বলল—এবার রূপবতীর বিয়ের ব্যবস্থা কর। হয় স্বয়ম্বর সভা ডাক। দেশ-বিদেশের রাজকুমাররা আসুক। মনের মত বর বেছে নিয়ে রূপবতী তার গলায় মালা দিক। না হয়, রাজ্যে রাজ্যে দূত পাঠাও। রাজকুমাররা একে একে আসুক। রূপবতীর যাকে পছন্দ তার সঙ্গেই বিয়ে দাও।

রাজা বলল—ঠিক বলেছ। আমি রাজ্যে রাজ্যে খবর পাঠাই। রাজকুমাররা আসুক। রূপবতী তাদিকে দেখুক। রূপবতীর যাকে মনে ধরবে, সেই রাজকুমারের সঙ্গে তার বিয়ে দোব।

রাজ্যে রাজ্যে দূত পাঠান হল। এক এক দিন এক এক রাজপুরী থেকে, এক এক জন রাজকুমার আসে। রাজকুমার রূপবতীকে দেখে মোহিত হয়ে যায়। কিন্তু রূপবতীর আর কাউকে পছন্দ হয় না। কাউকে দেখে বলে—ম্যা গো! নাকটা দেখ কেমন বোঁচা। কাউকে দেখে বলে—ম্যা গো! মুখটা যেন কুটুরে পেঁচা। কাউকে দেখে বলে—ম্যা গো! গাল দুটো কি ফোলা-

ফোলা। কাউকে দেখে বলে—ম্যা গো! দেখতে যেন আরশোলা। এমনি করে একটা খুঁত বের করে আর এক এক জন রাজকুমারকে বাদ দেয়। তারা মুখটি চুন করে রাজপুরী ছেড়ে চলে যায়। সখিরা আড়ালে মুখ টিপে টিপে হাসে আর বলে—বাপরে রূপের কি দেমাক। দেখবি ওর কপালে শেষে এক কেলে কাসুন্দি হাড়গিল্লে বর জুটবে। সেই যে বলে—

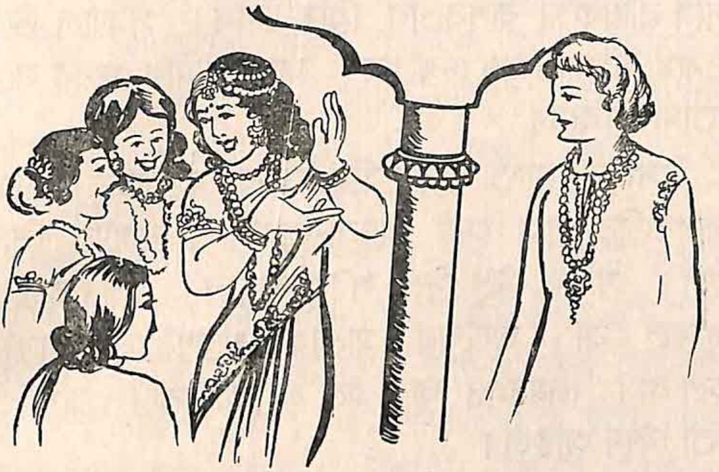
অতি বড় রূপসী বর না পায়।
অতি বড় ঘরনীর ঘর ভেঙ্গে যায়।

রূপবতীরও না সেই দশা হয়।

দেখেশুনে রাজার খুব ভাবনা হল। কত সুন্দর সুপুরুষ রাজকুমার এল। তাদের কাউকে পছন্দ হল না রূপবতীর। শেষে কি ওর বিয়ে হবে না।

একদিন হয়েছে কি, দূরদেশের এক রাজকুমার রূপবতীর নাম শুনে রাজপুরীতে এসে হাজির। তাহাকে কি সুন্দর দেখতে! যেমন টানাটানা চোখ, তেমনি বাঁশীর মত নাক, তেমনি চওড়া কপাল, তেমনি এক-মাথা কোঁকড়ানো ঘন-কাল চুল, তেমনি লম্বা-চওড়া শক্ত সমর্থ নিটোল শরীর। তাকে দেখে রাজা-রাণীর মনে খুব আনন্দ হল। ভাবল, এই রাজকুমারকে রূপবতীর খুব পছন্দ হবে। কিন্তু ওমা। রাজকুমরেকে দেখে রূপবতী নাক সিঁটকে সখিদের বলল—ওরে দেখ দেখ। এর চোখগুলো কি রকম ভেঁটার মত। এই ভেঁটা চোখো লোকটা কোথাকার রাজপুত্তুর রে।

রূপবতীর কথা শুনে সখিরা খিল্‌খিলিয়ে হেসে উঠল। লজ্জায় রাজকুমার ঘাড় হেঁট করে, রাজপুরী



এমন সুন্দর রাজকুমারকে রূপবতীর পছন্দ হল না

ছেড়ে চলে গেল। রেগে গিয়ে রাজা বলল—কাল সকালে যার মুখ দেখব তার সঙ্গেই বিয়ে দোব তোর। তোর এত রূপের দেমাক। এমন সুন্দর রাজকুমার। তাকেও তুই অপমান করে তাড়িয়ে দিলি।

পরদিন ভোর হল। রাজা দেউড়ীর কাছে গিয়ে একজনকে দেখতে পেল। তার গায়ের রঙ ময়লা। পরনে মালকোচা দিয়ে পরা মোটা সুতোর ধুতি। মাথায় ইয়া বড় পাগ্‌ড়ি। হাতে পাকে বাঁশের লাঠি। রাজামশাইকে দেখে সে এগিয়ে এল। পেন্নাম করে বলল—জয় হোক রাজামশাই।

রাজা বল্‌লে—কি চাই। লোকটি বলল—আমাকে আপনার সেপাই করে নিন। রাজা বলল—না। তুমি

আমার জামাই হবে। সে তো অবাক। রাজা বলল—আমি পণ করেছিলাম, সকালে উঠে যার মুখ দেখব তার সঙ্গে রাজকন্যা রূপবতীর বিয়ে দোব। সকালে উঠে প্রথমে তোমার মুখ দেখলাম। আজ আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে।

সেদিন রাতে রাজপুরীর অন্দর মহলের উঠোনে রূপবতীর সঙ্গে সেই অচেনা-অজানা লোকটার বিয়ে হল। সখিরা উলু দিল, শাঁখ বাজাল। কিন্তু বাজনা বাজল না ; আলোর মালায় রাজপুরীকে সাজান হল না। নেমন্তনও করা হল না কাউকে। রূপবতী তো কেঁদে আকুল।

পরদিন, তখনও ভোর হয়নি। সেই লোকটি রূপবতীকে নিয়ে রাজপুরী ছেড়ে চলে গেল। যাওয়ার আগে বলল, রূপবতী! রেশমী শাড়ি ছেড়ে, তাঁতের শাড়ি পর। গায়ের গয়না খুলে ফেল। আমি যেমন গরীব, তোমাকেও তেমনি গরীব ঘরের বৌয়ের মত থাকতে হবে। এখন তো তুমি রাজকুমারী নও, গরীবের বৌ।

কতদিন পরে, কত রাস্তা পায়ে হেঁটে, লোকটি রূপবতীকে নিয়ে নিজের দেশে পৌঁছাল। বলল, শোন রূপবতী। এই আমার ঘরবাড়ি। আমি এখানকার রাজবাড়ির সেপাই। তুমি এখন রান্না-বান্না কর। আমি রাজবাড়ি থেকে ঘুরে আসি।

লোকটি চলে যেতেই পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল

রূপবতী। রাজার মেয়ে সে। নিজে এক ঘটি জল গড়িয়ে সে কোনদিন খায়নি। দাসীরা তাকে স্নান করাতো, খাওয়াতো, গয়না পরাতো, ঘুম পাড়াতো। ঘুমিয়ে গেলে ময়ূরপংখী পাখার বাতাস দিয়ে হাওয়া করতো। সে রান্না করবে কি করে! ভয়ে, দুঃখে, রাগে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল সে।

দুপুর বেলায় বাড়ীতে পা দিয়েই লোকটি হাঁক পাড়ল—রূপবতী, ভাত বাড়। রূপবতী তখন দু'হাঁটুর ভিতরে মুখ গুঁজে বসে কাঁদছে। তাই-না দেখে, লোকটি রেগেমেগে বলল—একি! তুমি রান্নাবান্না না করে সেই থেকে বসে বসে কাঁদছ। দাঁড়াও! কালই তোমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

এমন সময় তুরী ভেরী রামশিঙা জগঝম্প বাজিয়ে সে দেশের রাজার সেপাই সেনাপতি মন্ত্রী বাড়ির ভিতরে ঢুকল। লোকটির সামনে দাঁড়িয়ে সবাই ঘাড় হেঁট করে বলল—রাজকুমারের জয় হোক। রূপবতী তো ভয়ে থরথর করে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে। লোকটি বলল—মুখ তোল রূপবতী! ভাল করে চেয়ে দেখ আমি তোমার সেই খেংরাওকো ছোক্‌রা। এই দেশের রাজকুমার আমি। তোমার বড় রূপের দেমাক ছিল। রূপের দেমাকে, অনেক রাজকুমারকে তুমি অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। আমাকেও খেংরাওকো বলে অপমান করেছিলে। রাগে তোমার বাবা, আমাকে চুপি চুপি ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর কথামত পরদিন

ভোরে আমি ছদ্মবেশে তোমাদের দেউড়ীর সামনে গিয়ে হাজির হই। চেয়ে দেখ তো আমাকে চিনতে পারছ কিনা।

লজ্জায় রূপবতী মুখ তুলে তাকাতে পারল না। হায় হায়! এমন সুন্দর রাজকুমারকে সে নাকি বলেছিল—ভেঁটা-চোখো ছোক্‌রা!

পরদিন ভোর হতে-না-হতেই চতুর্দোলায় চেপে রাজরাণীর বেশে রূপবতী বাপের বাড়ী যাওয়ার জন্য রওনা হল। সঙ্গে অবশ্য রাজকুমারও গিয়েছিল, সাদা রঙের তেজী ঘোড়ার পিঠে চড়ে।

ডানা কাটা পরী

এক যে ছিল রাজা। তার একটা সুন্দর ফুল-বাগান ছিল। ফুলবাগানের মাঝখানে ছিল বিরাট একটা দীঘি। সেই দীঘির জলে অনেক পদ্মগাছ ছিল। দীঘিতে রোজ একটি করে সোনার পদ্মফুল ফুটত। রাজার মালী রোজ সকালে সেই ফুলটি তুলে এনে রাজাকে দিত। সেই ফুল দিয়ে রাজা রোজ শিবঠাকুরের পূজো করত।

একদিন সকালবেলা। রাজা দেউড়ীতে বসে

আছেন। এমন সময় হাঁফাতে হাঁফাতে মালী এসে বলল, মহারাজ ভয়ে বলি না নির্ভয়ে বলি।

রাজা বলল—নির্ভয়ে বল।

মালী বলল—মহারাজ, ভোরবেলা দীঘির জলে পদ্মফুল তুলতে গিয়ে দেখি ফুল নেই। কে চুরি করে নিয়ে গেছে। আমি কি করব মহারাজ।

রাজা বলল—তুমি আর কি করবে। তবে রাজবাড়ির ভেতরে চোর ঢুকল কি করে? সেটা তো খুঁজে বের করতে হবে। এমন সময় রাজার বড় ছেলে সেখানে এসে হাজির। রাজা তাকে ডেকে বলল—আজ সারা রাত তুমি দীঘির ঘাটে পাহারা দেবে। ফুল চোরকে ধরা চাই-ই-চাই।

বড় রাজকুমার সারা রাত দীঘির ঘাটে বসে পাহারা দেয়। যখন ভোর হয় হয় সেই সময় ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে লাগল। হাওয়ায় একটা সুন্দর মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। বড় রাজকুমারের চোখ ঘুম ঘুম হয়ে উঠল। দু' চোখের পাতা বুজে এল। ঘুম যখন ভাঙল তখন দেখল—দীঘির জলে সেই পদ্মকুঁড়িটি নেই। কে যেন চুরি করে নিয়ে গেছে।

যাঃ! হায় হায় করতে লাগল বড় রাজকুমার। রাজার ছেলে হয়ে সে ঘুমকে জয় করতে পারল না! একটা ফুল চোরকে ধরতে পারল না! কি করবে সে এখন! কি বলবে সে রাজাকে!

সকালবেলা। রাজা ঠাকুরঘরের ভিতরে বাঘ-

ছালের আসনে বসে। পূজায় বসবে। এমন সময় বড় রাজকুমার মুখটি নীচু করে এসে দাঁড়াল। রাজা বুঝল, সেদিনও কেউ ফুল চুরি করে নিয়ে গেছে। চোর ধরতে পারেনি বড় রাজকুমার। সব শুনে রাজা বলল—দূর হও আমার সামনে থেকে। তারপর দাসীকে বলল—মেজ রাজকুমারকে ডেকে দাও।

মেজ রাজকুমার তাড়াতাড়ি রাজার সামনে এসে হাতজোড় করে দাঁড়াল। রাজা বলল—তোমার দাদা যা পারেনি, তুমি কি তা পারবে? ধরতে পারবে ফুল চোরকে?

মেজ রাজকুমার, দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল—যো হুকুম মহারাজ। ফুল চোরকে ধরে আপনার সামনে আমি হাজির করবই করব।

খুশি হয়ে মেজ রাজকুমার সেখান থেকে চলে গেল। সারা রাত দীঘির চারপাশে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল। হাতে তার খোলা তলোয়ার। ঘুরে ঘুরে ভোরের দিকে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ঠিক সেই সময়, এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে মেজ রাজকুমারের সারা শরীর যেন জুড়িয়ে দিল। মিষ্টি গন্ধে ভোরের হাওয়া কেমন ভারি ভারি হয়ে উঠল। মেজ রাজকুমার বেশ আমেজের সঙ্গে বলে উঠল—আঃ কি আরাম। তারপর আস্তে আস্তে দুটি চোখের পাতা বুজে গেল। কাকের ডাকে মেজ রাজকুমার জেগে উঠে দেখে-কি ফুলও নেই; ফুল-চোরও নেই।

সব শুনে রাজামশাই রেগেমেগে বললেন—দূর হও আমার সামনে থেকে। তুমিও তোমার দাদার মত অপদার্থ। যাও ছোট রাজকুমারকে আমার কাছে আসতে বল।

ছোট রাজকুমার রাজার সামনে এসে দাঁড়াতেই রাজা বলল—তোমার দাদারা যা পারেনি, তোমাকে তা পারতে হবে। আজ রাতে ফুল-চোরকে ধরা চাই-ই-চাই। যদি পার—এ রাজ্যের রাজা তুমিই হবে। তোমাকে আমি যুবরাজের আসনে বসাব। আর যদি না পার······



সেই ফুল-চোরকে আমার সামনে হাজির কর

রাজার কথার খেই ধরে ছোট রাজকুমার বলে উঠল—যদি না পারি কাউকে না জানিয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে যাব। সে কালামুখ আমি কাউকে দেখাব না।

রাজা খুসী হয়ে বললেন—এই তো রাজার ছেলের মত কথা। যাও বৎস। যেমন করে পার—সেই ফুল-চোরকে ধরে নিয়ে এসে আমার সামনে হাজির কর। যত লোকজন, সৈন্য-সামন্ত লাগে নিতে ভুলো না। যত টাকা লাগে রাজকোষ থেকে নিতে পার। দেখো, তোমার দাদাদের মত যেন হেরে যেও না।

ছোট রাজকুমার সেদিন নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেল। ঘোড়া ছুটিয়ে একবার এখানে যায়। একবার ওখানে যায়। রাজবাড়ির পুঁথিশালায় বসে, পুঁথি টেনে বের করে পড়তে বসে। শেষকালে সে গেল রাজবাড়ির মহাজালিকের কাছে। রাজবাড়ির যত কাপড় লাগে সবই তার তাঁত ঘরে বোনা হয়। তার অনেক বয়স। তার সঙ্গে চুপি চুপি কত কি কথা বলে, সে ফিরে এল রাজপুরীতে। বিকাল হতে-না-হতে মহাজালিককে সঙ্গে নিয়ে গেল সে দীঘির ধারে। দীঘির এদিকে ওদিকে ঘুরেফিরে হু'জনাই বাড়ি ফিরে যায়। শুধু ছোট রাজকুমার মহাজালিককে বলল—সাবধান কেউ যেন জানতে না পারে।

রাতের আঁধার ঘনিয়ে এল। ছোট রাজকুমার দীঘির ধারে গিয়ে হাজির হল। তবে সে শ্বেতপাথরে বাঁধানো দীঘির ঘাটে গিয়ে বসল না। দীঘির পাড়ে ছিল একটি বটগাছ। সেই বটগাছে উঠে পাতার আড়ালে বসে থাকল সে। মাথার পাগড়ি খুলে, গাছের ডালের সঙ্গে, সেই পাগড়ি দিয়ে নিজেকে বেশ শক্ত করে বেঁধে

ফেলল। যদি ঘুমিয়ে পড়ে—তাহলে ঘুমের ঘোরে গাছ থেকে গড়িয়ে নীচে পড়ে যাবে না।

সেদিনও ভোর রাতে ঠিক আগের মতই ঘটনাগুলো পর পর ঘটে গেল। ঘুমে ছোট রাজকুমার ঢুলতে লাগল। হাজার চেষ্টা করেও, চোখের পাতা খুলে রাখতে পারল না। কি সুন্দর মিষ্টি গন্ধ আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। চোখ খুলে রাখা দায় হয়ে উঠল ছোট রাজকুমারের। ঘুম-ঘুম ঘুম-ঘুম করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল ছোট রাজকুমার।

হঠাৎ ঘন ঘন হেঁচকা টানে ঘুম ভেঙ্গে গেল ছোট রাজকুমারের। জেগে উঠেই শুনতে পেল—দীঘির জলে ওথাল-পাতাল ঢেউ তোলার শব্দ। সেই সঙ্গে মনে হল, কে যেন করুণ সুরে কেঁদে চলেছে। আহা কি মিষ্টি গলা।

ছোট রাজকুমারের কোমরে বাঁধা পেটিকায় ছিল শাঁখ। পেটিকার ভিতর থেকে শাঁখটি তাড়াতাড়ি বের করে জোরে ফুঁ দিল সে। দীঘির ধারে ফুল-বাগানে লুকিয়ে ছিল সেপাই-সান্ত্রীর দল। ভোরের মিষ্টি হাওয়ায়, তারাও ঘুমিয়ে পড়েছিল। শাঁখের আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল তাদের। তাদের কারও হাতে তলোয়ার, কারও হাতে বা বর্শা, কারও হাতে বা সিঁদুর দিয়ে চোখ আঁকা বলিদানের খাড়া। ঘুম ভেঙ্গে যেতেই তারা তাড়াতাড়ি ছুটে এল দীঘির পাড়ে।

ছোট রাজকুমার ততক্ষণে নেমে পড়েছে গাছ থেকে।

সবাই অবাক হয়ে দেখে, তার কোমরে দড়ি বাঁধা। আর দীঘির জলে একটি মেয়ে, গা ভাসিয়ে যেন উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। সরু সুতোয় বোনা শক্ত জালে আটকা পড়েছে মেয়েটি। সবাই ভাবে—বাপ্‌রে! কি বুদ্ধি ছোট রাজকুমারের। আহা-রে কি তার রূপ। আর ডাঁটা ভাঙ্গা সোনার পদ্মফুলটি জলে ভাসছে।

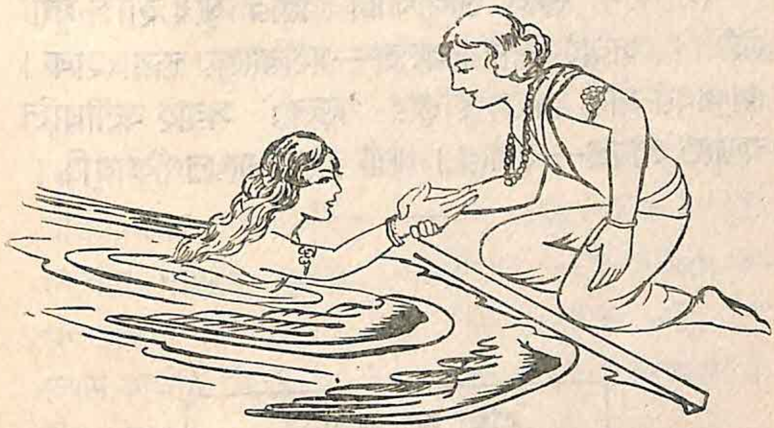
ছোট রাজকুমার কোমর থেকে দড়িটি খুলে, সেপাই সান্ত্রীদের হাতে দিয়ে বলল—সাবাস জোয়ান!

তারা এক হেঁচকা টান দিয়ে বলল—হেঁইও। ছোট রাজকুমার আবার বললেন—জোরসে টান। তারা একটা জোর টান দিয়ে বলল—হেঁইও। ছোট রাজকুমার আবার জোর গলায় বলল—আরও জোর। সেপাই-সান্ত্রীরা দড়িতে আরও জোর টান দিয়ে বলল —হেঁইও।

টানে টানে মেয়েটি তখন একেবারে দীঘির ধারে চলে এসেছে। সবাই ভেবেছে রাজপুরীর কোনও সুন্দরী দাসী হবে বুঝি। রোজ মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে ফুল তুলে নিয়ে যায়। আজ ধরা পড়ে গেছে।

ছোট রাজকুমার তাড়াতাড়ি জলের ধারে ঝুঁকে পড়ে মেয়েটিকে টেনে তোলার জন্যে তার গায়ে হাত দিতেই সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। বলল, করলে কি রাজকুমার। আমি তোমাদের রাজপুরীর

কেউ নই। আমি মানুষ নই। আমি যে ফুলপরী। এই দেখ, তুমি ছুঁয়ে দিলে বলে আমার ডানা দুটি খসে পড়েছে।



দুটি রঙিন সুন্দর ডানা জলে ভাসছে

সবাই অবাক হয়ে দেখে—তাই তো! দুটি রঙীন সুন্দর ডানা, জলের উপরে ভাসছে।

ফুলপরী কাঁদতে কাঁদতে বলল—আমি এখন পরীদের রাজ্যে ফিরে যাব কি করে। ওগো! ছোট রাজকুমার। আমার কি হবে?

ততক্ষণে খবর ছড়িয়ে পড়েছে রাজপুরীতে। ধরা পড়েছে এক রূপসী ফুল-চোর! রাজা সে খবর পেয়েই ছুটে এসেছিল দীঘির ধারে। কোন কথা না বলে, এতক্ষণ সে চুপচাপ ছোটরাজকুমারের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। ফুলপরীর কান্না শুনে রাজা এগিয়ে এসে তার মাথায় হাত দিয়ে বলল—তুমি তো এখন ফুলপরী

নও। তুমি এখন ডানাকাটা পরী। নাইবা ফিরে গেলে পরীদের রাজ্যে। এখানেই থাকবে তুমি। তোমার সঙ্গে ছোট রাজকুমারের আমি বিয়ে দোব।

সে কথা শুনে ডানাকাটা পরীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। সবাই চেঁচিয়ে বলল—মহারাজের জয় হোক। সে খবর সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই বলাবলি করতে লাগল—বাপ্‌রে! ছোট রাজকুমারের কি বুদ্ধি।

রাজা হল বনমানুষ

এক যে ছিল রাজা। রাজা ভারি বদরাগী। রেগে গেলে থর থর করে কাঁপত আর বলত—শির লাও। শির লাও। মানে মাথা কেটে ফেল। রানী, রাজপুত্তুর, রাজকন্যে, মন্ত্রী, সেনাপতি—সবাই রাজাকে খুব ভয় করত। ভয়ে কেউ রাজার সঙ্গে যেচে কথা বলত না।

একদিন দুপুর বেলা। রাজা খেতে বসেছে। গোমড়া মুখে শ্বেত পাথরের পিঁড়ির উপরে বসে আছেন রাজা। সামনে শ্বেত পাথরের ফুলকাটা চৌকি। চৌকির উপর সোনার থালায় ঘি মৌ মৌ মিহি মিহি বাস চালের ভাত। থালার চারপাশে এক সারি রূপোর বাটিতে নানারকম তরকারি; ক্ষীরের পায়েস,

তিলতক্তি, পাটিসাপটা, চন্দ্রপুলি, আরও রকমারি মিষ্টি সন্দেশ। দাসীরা ময়ূরপংখী পাখা দিয়ে বাতাস করছে। রানী পাশে বসে। রাজা খেতে শুরু করল। ভাজা দিয়ে ভাত খেয়ে যেই মাছের ঝোলের বাটি থেকে রুই মাছের মুড়োটি তুলেছে অমনি সদর দেউড়ি থেকে মুরগীর ডাক ভেসে এল—কোঁকর কো। ব্যাস! কোথায় গেল খাওয়া। রাজা রেগেমেগে ভাতের থালায় মারল কষে এক লাথি। সোনার থালা, রূপোর বাটি, মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল ঝন্ঝনিয়ে। দাস-দাসীরা ভয়ে ঘর ছেড়ে পালাল। রাজা পিঁড়ি থেকে উঠে, হাত নেড়ে রানীর দিকে তাকিয়ে বলতে বাগল—শির লাও! শির লাও।

কি সর্বনাশ। রানী তাড়াতাড়ি এক দাসীকে ইসারা করলেন—যা ডেকে নিয়ে আয় মন্ত্রীকে। তারপর রাজার মাথায়-মুখে জল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করল তাকে। তারপর রাজাকে শোওয়ার ঘরে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। দাসীরা জোরে জোরে হাওয়া করতে লাগল। রাজা খানিক পরেই নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগল—ভোঁরোঁর-ভোঁ!

বাপরে বাপ! রানী তো মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে শুরু করে দিল। ঘুম থেকে উঠে রাজা তো আর একদফা চেঁচামেচি শুরু করে দেবে। কি করে তখন সামলান যাবে তাকে। সেই ভাবনাতেই রানী তো অস্থির।

রাজা ঘুমিয়ে পড়তেই রানী ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দরজার সামনেই মন্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিল। রানী বলল—মন্ত্রী শুনেছো সব কথা।

দু'হাত জোড় করে মন্ত্রী বলল—শুনেছি রানীমা।

রানী বলল, কার মুরগী খোঁজ নাও। তাকে সিপাই দিয়ে পেছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে এস। দারোয়ান কোথা? সে সদর দেউড়ী খুলে রাখে কেন? না রাখলে কি খাওয়ার সময় রাজবাড়ীতে মুরগী ঢুকত? না মহারাজের খাওয়া নষ্ট হত? তাকে ফাটকে আটক কর। তারপর হয় শূলে চড়াও; না হয় ফাঁসিতে লটকে দাও বেটাকে। আর যার মুরগী তার মাথা মুড়িয়ে, গায়ে আল্‌কাতরা মাখিয়ে, ঢাক ঢোল পিটিয়ে শহর থেকে বের করে দেবে। তাহলে এর পরে কেউ আর মহারাজার খাওয়ার সময়, না ছাড়বে ছাগল, না ছাড়বে মুরগী।

ঘাড় কাত করে মন্ত্রী বলল—জো হুকুম রানী মা।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে সেনাপতি এসে বলল—পেয়েছি রানীমা। বেঁধে এনেছি বেটাকে।

রানী বলল—রেখেছো কোথায় নাম কি?

সেনাপতি বলল, বেটার নাম হোঁদল। বেটাকে পিছমোড়া করে বেঁধে উঠানের শানে চিত করে ফেলে বুকে পাথর চাপিয়ে দিয়েছি।

রানী বলল—বেশ করেছ। এখন যাও, ওর গায়ে আল্‌কাতরা মাখিয়ে, ঢাক ঢোল পিটিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে

এস। আসছে মাস থেকে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

তা রানীর হুকুমে হোঁদলের গায়ে আলকাতরা মাখিয়ে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে শহর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। ভয়ে সবাই চুপ। কারও মুখে কোন কথাটি নেই। ঘুম থেকে উঠে রাজা বলল—ঠিক করেছ রানী। আজ রাতে হাতা-গরম খিচুড়ি আর ডিমের বড়া ভাজা রাঁধতে বল দিকি। জুত করে খাওয়া যাবে।

রাতের বেলা রাজা জুত করে ডিমের বড়া ভাজা দিয়ে গরমা-গরম খিচুড়ি খেল। পরদিন মন্ত্রীকে ডেকে হুকুম দিল—মন্ত্রী! তুমি ঢেড়া পিটিয়ে দাও—আমার রাজ্যে গরু-ভেড়া-হাঁস-মুরগী-ছাগল পোষা চলবে না। যে পুষবে, তার গর্দান যাবে। রাজার হুকুম মত গাঁয়ে গাঁয়ে ঢেড়া পিটিয়ে দিল ঃ—

ডুম্-ডুমা-ডুম্। ডুডুম্-ডুডুম্।
হুকুম, মহারাজার হুকুম।
হাঁস মুরগী গরু ছাগল
চলবে নাক পোষা।
পুষলে পরে বুঝবে ঠেলা
রাজার হবে গোসা।
শুনছো সবাই ? মনে রেখো
কথা কিন্তু খাঁটি।
পুষলে পরে ঘ্যাচাং ! মাথা
নেওয়া হবে কাটি।

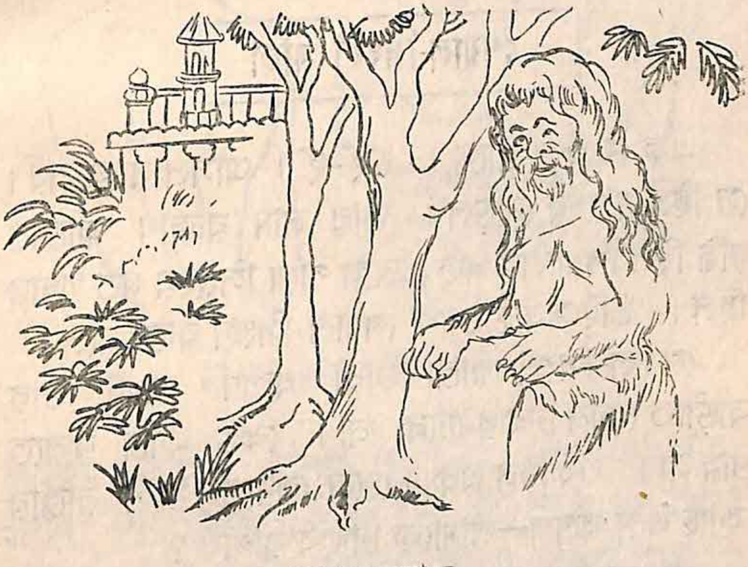
ঢেড়া শুনে সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। হাঁস মুরগী গরু ছাগল পুষবে না ! তাহলে চাষবাস হবে কি করে খাবে কি ? দূর দূর। এ রাজ্যে আর বাস করব না। এই না বলে রাতের অন্ধকারে, রাজ্য ছেড়ে সবাই একে একে চুপি চুপি পালিয়ে গেল।

তখন কি হল ? কেউ চাষ করে না। তাই ফসল ফলে না। কেউ গরু পোষে না। তাই দুধ মেলে না। কেউ হাঁস মুরগী ছাগল পোষে না। তাই ডিম মেলে না ; মাংস মেলে না। লোকে খাবে কি ? একে একে তাই কামার, কুমোর, তাঁতী, ছোতর, জেলে, মালো, বামুন বদ্যি, মুটে মজুর, মুচি, নাপিত সবাই রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গেল। মন্ত্রী, সেনাপতি, ভাঁড়ারী, খাজাঞ্চি, কোটাল, ঘাটোয়াল—তারাও রাজার চাকরী ছেড়ে চুপি চুপি পালাল।

কি করা যায় এবার। গালে হাত দিয়ে রাজা বসে বসে ভাবতে থাকে। রাজা রানীর দোষ দিয়ে বলে—তোমার জন্যেই হল। তুমি হোঁদলবেটার গায়ে আলকাতরা মাখিয়ে তাড়িয়ে দিতে না বললে কেউ রাজ্য ছেড়ে পালাত না। রানী ঠোঁট ফুলিয়ে বললে—হাঁ! আমার জন্যে হল বৈকি ? তুমি হাঁস-মুরগী গরু-ছাগল পুষতে বারণ করে দিলে কেন। তাই তো সবাই রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গেল। শেষে রানী বলল—চল ! আমরাও এখান থেকে পালিয়ে যাই। রাজা বলল—কোথায় যাব ? রানী বলল—কেন ? আমার

বাপের বাড়িতে। রাজা বলল—বাপরে বাপ! আমাকে মাপ কর। যেতে হয় তুমি যাও। আমি এখানেই পড়ে থাকব।

রানী বলল—এখানে যে থাকবে তা খাবে কি? রাজা বলল—কেন বনের ফল; নদীর জল। রানী বলল—পরবে কি? রাজা বলল—গাছের ছাল, গাছের লতা। রানী বলল—কে তোমার নখ চুল কেটে দেবে, গোঁফ ছেঁটে দেবে? রাজা বলল—ছাঁটব না। গায়ের জিনিস গায়েই থাকবে।



রাজা হল বনমানুষ

রানী আর কি করবে? রাজপুত্তুর, রাজকন্যেকে তো খাইয়ে মাখিয়ে বাঁচাতে হবে। রানী তাই রাজাকে ছেড়ে চলে গেল বাপের বাড়ি। কয়েক বছর যেতে না

যেতে—সারা রাজ্যে বন জঙ্গলে ঢেকে গেল। রাজা বনেই থাকে। বনের ফল, নদীর জল খায়। মাথায় এক মাথা চুল। মুখে এক মুখ গোঁফ দাড়ি। হাতের পায়ের কুড়ি আঙ্গুলে ইয়া বড় বড় নখ। দেখলে মানুষ বলে মনেই হয় না। রাজা ছিল মানুষ। নিজের দোষে হয়ে গেল বনমানুষ।

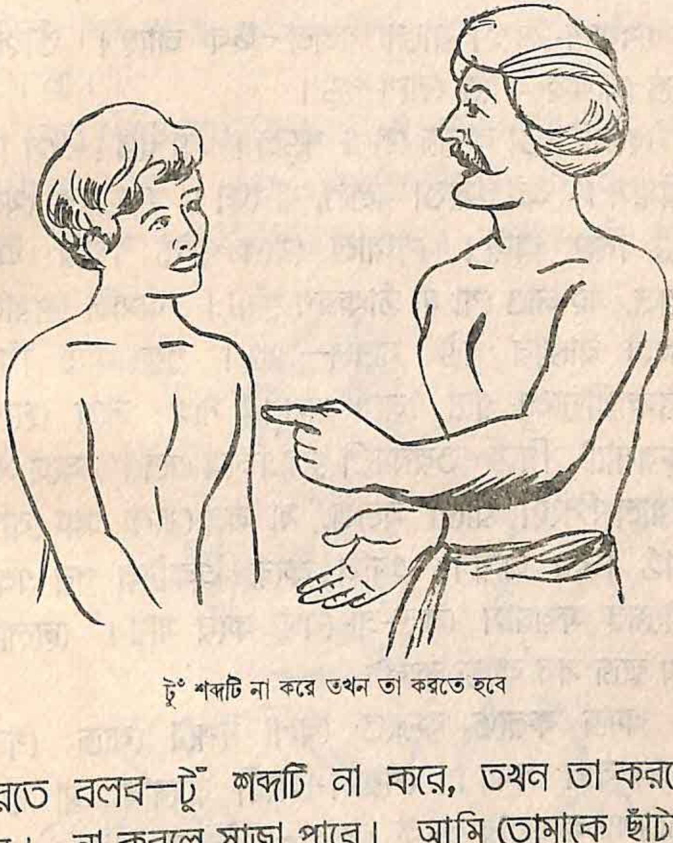
শেয়াল-সিংহী রাজা

এক যে ছিল রাজা। উহুঁ-হুঁ। আসল রাজা নয়। সে ছিল গাঁয়ের মোড়ল। তার নাম রাজা। রাজার বুদ্ধি ছিল শেয়ালের মত; আর গায়ে সিংহের মত জোর ছিল। তাই সবাই তাকে শেয়াল-সিংহী রাজা বলে!

শেয়াল-সিংহী রাজা ভারী কৃপণ। তাই তার বাড়ীতে কোন চাকর টেকে না। কেউ কাজ করতে চায় না। একদিন একটা ছেলে শেয়াল-সিংহী রাজার কাছে এসে বলল—আমাকে চাকর রাখবে?

শেয়াল-সিংহী রাজা বলল—হাঁ রাখব। মাস গেলে তিরিশ টাকা মাইনে পাবে। বেলা দশটায় একপাতা মুড়ি, একবাটি গুড় খেতে দোব। দুপুরে এক থোড়া ভাত, এক বাটি ডাল, এক বাটি তরকারী খেতে

পাবে ; রাতেও তাই। রোজ একপলা তেল দোব— গায়ে মাখা স্নান করার জন্যে। কিন্তু আমি যখন যে



টুঁ শব্দটি না করে তখন তা করতে হবে

করতে বলব—টুঁ শব্দটি না করে, তখন তা করতে হবে। না করলে সাজা পাবে। আমি তোমাকে ছাঁটাই করলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দোব, পঞ্চাশ ঘা জুতো খাব, পঞ্চাশ হাত নাক-খত খাব। আর তুমি চাকরীতে জবাব দিলে, তোমাকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে হবে, পঞ্চাশ ঘা জুতো খেতে হবে, পঞ্চাশ হাত নাক-খত দিতে হবে। কি রাজী ?

ছেলেটি ভারি কাজের। সে ভাবল, খাওয়াদাওয়ার যখন কম্‌তি নেই তখন তো দুর্গা দুর্গা বলে কাজে ঢুকে পড়ি। তারপর যা আছে কপালে। সে বলল, রাজী।

শেয়াল-সিংহী রাজা বলল—ঠিক আছে। তাহলে আজ থেকেই কাজে লেগে পড়।

ছেলেটি তো কাজে লেগে পড়ল। বাপ্‌রে! সে কি ফরমাস। এই হয়তো বলল, যা তো! গোয়াল থেকে ঘুঁটে নিয়ে আয়। গোয়াল থেকে ঘুঁটে নিয়ে এসে বলল, এই নাও গো মা ঠাকরুণ ঘুঁটে। অমনি শেয়াল-সিংহী রাজার বউ বলল—যাও! পুকুরঘাটে গিয়ে, তরকারীগুলো ধুয়ে নিয়ে এস। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি পুকুরঘাটে গিয়ে তরকারী ধুয়ে নিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে শেয়াল-সিংহী রাজা বলল, যা বন থেকে এক বোঝা কাঠ নিয়ে আয়। এমনি করে একটার পর একটা কাজের ফরমাস কেউ-না-কেউ করে যায়। ছেলেটিও মুখ বুজে সব কাজ করে।

কাজ করতে করতে বেলা দশটা বেজে গেল। জলখাবার সময়। শেয়াল-সিংহী রাজার মা তখন খ্যান্‌খ্যানে গলায় ডেকে বলল—কই গো বাছা! মুড়ি খাবে এস।

ছেলেটি তো খুসী খুসী মুখে, তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে এসে উঠানের একপাশে এসে বলল—কই গো মা-ঠাকরাণ। খেতে দাও। সকাল থেকে অনেক খাটা-খাটনি পেটে খিদেও বেশ চম্‌চমে। ছেলেটা

ভাবছে—যাক বাবা। এক পাতা মুড়ি। এক বাটি গুড়। বেশ জুত করে জল দিয়ে ভিজিয়ে, কাঁচা লঙ্কা আর পিঁয়াজ কামড়ে গুড় মুড়ি খাওয়া যাবে। চাইলে কি আর একটা কাঁচা লঙ্কা আর পিঁয়াজ দেবে না।

কিন্তু খেতে দেওয়ার সময়, ছেলেটি হু'চোখ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। ওমা, শেয়াল-সিংহী রাজার মা, তার সামনে একটি কাঁঠাল পাতা পেতে এক পাতা



কাঁঠাল পাতায় মুড়ি আর মধুপর্কের এক বাটি গুড় খেতে দিল

মুড়ি আর পূজোয় দেওয়া মধুপর্কের বাটি করে এক বাটি গুড় ঠকাস করে নামিয়ে দিয়ে বলল, খাও বাছা।

ছেলেটি বলল, এই কটি মুড়িতে কি পেট ভরে। অমনি কোথা থেকে শেয়াল-সিংহী রাজা হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে বলল—উহুঁ! উহুঁ! কথাটি বলা চলবে না। তোর সঙ্গে চুক্তি ছিল—এক পাতা মুড়ি আর এক বাটি গুড় জল খেতে দেওয়া হবে। তাই দিয়েছি। এই দেখ এক পাত মুড়ি। এই দেখ এক বাটি গুড়। মুখটি বুজে খেয়ে নে ব্যাটা।

ছেলেটি আর কি বলবে! ভাবল, যাক সে মুড়ির শোধ ভাতে তুলবে। এক ঘোড়া ভাত দেওয়ার কথা। যত ছোট ঘোড়াই হক—একটা জামবাটির মত তো হবেই। ঘোড়া তো আর গাছে ফলে না যে ছোট্ট বটপাতার মত একটা ছোট্ট ঘোড়া ছিঁড়ে নিয়ে চলে আসবে।

দুপুর বেলা ভাত খেতে বসে সে আর এক কাণ্ড। বিরাট একটা বড় ঘোড়া এনে ছেলেটির সামনে নামিয়ে দিল। তারপর ফেন সইতে ঘোড়ায় ঢেলে দিল। আর ঠিক মধুপর্কের বাটির মত বাটি করে এক বাটি ডাল, আর এক বাটি জল দিয়ে গেল। অবশ্য নুন দিয়েছিল অনেকটা।

কি আর করবে। ছেলেটি ঘোড়ার ভিতরে হাত ডুবিয়ে দেখল—ঘোড়ার নীচে দু'মুঠো কি বড় জোর তিন মুঠো ভাত পড়ে। বাকীটা সবই ফ্যান। ছেলেটি চোখের জল ফেলতে ফেলতে সেই ভাত কটি খেয়ে, চোঁ চোঁ করে চুমুক দিয়ে খানিকটা ফেন খেল। তারপর

কাঁদতে কাঁদতে ঘোড়া তুলে নিয়ে পুকুর ঘাটে আঁচাতে গেল। রাতেও ঠিক ঐ রকম করে এক ঘোড়া ভাত, এক বাটি ডাল, এক বাটি তরকারী খেতে দিল। ছেলেটি তাই খেয়ে, তালপাতার চেটাই পেতে শুয়ে, হায় ভগবান! কপালে এও ছিল, বলে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল একসময়ে।

পর পর তিনদিন ছেলেটি কোনমতে মুখ বুজে কাজ করল। চারদিনের দিন, সে আর থাকতে পারল না। শেয়াল-সিংহী রাজার কাছে গিয়ে বলল—আমি আর কাজ করতে পারব না। শেয়াল-সিংহী রাজা বলল, তাহলে খাও পঞ্চাশ ঘা জুতো। দাও পঞ্চাশ হাত নাক-খত। আর একটি করে গুনে দাও পঞ্চাশ টাকা।

ছেলেটি বলল—আমার কাছে তো টাকা নেই। শেয়াল-সিংহী রাজা বলল—টাকা নেই তো হয়েছে কি? বন থেকে পঞ্চাশ বোঝা কাঠ কেটে এনে খামার বাড়িতে ফেল।

ছেলেটি তাই করল। সারা দিনে পঞ্চাশ বোঝা কাঠ কেটে এনে খামার বাড়িতে জড় করল। বিকাল-বেলা সকলের সামনে মাপা পঞ্চাশ হাত নাক-খত দিল। তারপর শেয়াল-সিংহী রাজা গুনে গুনে পঞ্চাশ ঘা জুতো মেরে ছেলেটিকে তাড়িয়ে দিল বাড়ি থেকে।

কাঁদতে কাঁদতে ছেলেটি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ তার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বন্ধুটি বলল—

কিরে ? তুই এদিকে কোথায় এসেছিলি ? আর কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিস-ই বা কোথায় ?

ছেলেটির মুখে সব কথা শুনে বন্ধুটি বলল—ঠিক আছে। তোর এই অপমানের শোধ আমি নোব। তবেই আমার নাম ফৎনা। দেখ না। বেটার ফৎনা ডুবিয়ে ছাড়ব আমি। তা চল এখন আমার বাড়িতে। সেখানে দিনকতক খাওয়াদাওয়া করে শরীরটাকে একটু ঝালাই করে নিবি চল।

বন্ধু তো ছেলেটিকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। সব কথা শুনে তার বাবা-মা বলল—আহারে ! তোমার শরীরের উপর দিয়ে তাহলে তো খুব ধকল গেছে বাছা। তা থাক না বাছা এখানে দিন কতক। খাবেদাবে ঘরের ছেলের মত কাজ করবে। তুমি কি আমাদের পর !

দিন কতক পরের কথা। শেয়াল-সিংহী রাজা তার বাড়িতে বৈঠকখানায় বসে তামাক খাচ্ছে। ফৎনা তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বলল—আমায় চাকর রাখবেন মশায়। শুনলাম, আপনার বাড়িতে কাজের লোকের দরকার।

হুঁকোর নল থেকে মুখটি নামিয়ে, শেয়াল-সিংহী রাজা শুধোল—তুমি কে হ্যা ছোক্‌রা—নাম কি ?

ফৎনা বলল—আজ্ঞে আমি ছোকরাই বটে। আমার নাম ফৎনা।

শেয়াল-সিংহী রাজা বলল—তা ফৎনাই হও আর ঘ্যাদ্‌নাই হও ঠিক মত কাজ করলেই হল। আর না করলেই কিন্তু মুশকিল।

ফৎনা বলল—কাজ করব বলেই তো আপনার 'ছি-চরণে' এসেচি মশায়। ঠিক মত কাজ করি কিনা যাচিয়ে নেবেন। যে যা বলবেন ঠিক তাই করব।

শেয়াল-সিংহী রাজা বলল—ঠিক আছে। তাহলে শোন একটা কথা। তারপর সেই আগেকার ছেলেটির সঙ্গে যে রকম শর্ত হয়েছিল, সেই সব শর্তের কথা পরপর বলে গেল। ফৎনা বলল—হাঁ হাঁ। তাতে কোন অসুবিধে হবে না। তবে আমারও একটা কথা আছে।

শেয়াল-সিংহী রাজা বলল—বল কি কথা? ফৎনা বলল—শর্তগুলো একটা কাগজে লিখে দু'জনাকেই সই করতে হবে। পাড়ার পাঁচজনের সাক্ষী হিসেবে দেওয়া চাই। তবেই আমি রাজী।

শেয়াল-সিংহী রাজা বলল—ভাল কথা। তাই করছি। এই বলে পাড়ার পাঁচজনে ডেকে কাগজে সবকিছু লিখে, সবাই সই করল।

পরদিন সকাল থেকেই ফৎনা কাজে লেগে গেল। যে যা ফরমাস করে, ফৎনা মুখ বুজে হাসি মুখে সব কাজ করে দেয়। কাজ খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কাজ করতে সময়ও বেশী নেয় না। কাজ করতে করতে

বেলা দশটা বেজে গেল। অমনি ফৎনা উঠোন থেকে হাঁক পাড়ল—খেতে দাও মা-ঠাক্‌রুণ। বেলা দশটা যে বেজে গেল গো।

খেতে দিতে এসে শেয়াল-সিংহী রাজার মায়ের দু'চোখ তো ছানাবড়া। সামনে ইয়া বড় এক আঙ্গট কলাপাতা পেড়ে ফৎনা বসে আছে আর মিট্‌ মিট্‌ করে হাসছে।

রেগেমেগে শেয়াল-সিংহী রাজার মা চেঁচিয়ে বলে উঠল—ওরে ও মুখপোড়া! অলপ্পেয়ে! যমরাভুগো! ভেবেছিস, তোকে এক কলাপাতা মুড়ি দোব। এই নে খা। বলে, কলাপাতার পাশেই একটি কাঁঠাল পাতা নামিয়ে এক কাঁঠাল পাতা মুড়ি ঢেলে দিল।

ফৎনা অমনি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে, শেয়াল-সিংহী রাজার মায়ের সামনে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল—সেটি হবে না। মা-ঠাকরোণ। কাগজে লেখা আছে—এক পাতা মুড়ি জলখাবার। কলাপাতা কি কাঁঠাল পাতা, পাতা আমি আনব, কি তোমরা দেবে—সে সব কথা তো লেখা নেই। এক কলাপাতা মুড়িই আমায় দিতে হবে। খাই না-খাই সে আমি বুঝব।

শেয়াল-সিংহী রাজার মা চেঁচাতে চেঁচাতে, হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—বেরো বেরো। মুখপোড়া! এখনই দূর হয়ে যা বাড়ি থেকে। তোর মত লোকের মুখে আগুন।

ফৎনাও চীৎকার করে বলল—বেরোব কি? আমার নাম ফৎনা! তোমার ছেলে বলেছে ন্যাদ্‌না। আমাকে বেরো বললেই বেরোব। কি কাগজে লেখা আছে জান না বুঝি।

চীৎকার শুনে শেয়াল-সিংহী রাজা ছুটে এল। পাড়ার লোকজন এসে জড় হল। তাদের ভেতরে সেই পাঁচজনও ছিল। সব শুনে তারা বলল—তা ঠিক। কাগজে তো কে পাতা আনবে, কি পাতা আনবে তা লেখা নেই। একপাতা মুড়ি দেওয়ার কথা, তা একপাতা মুড়িই দিতে হবে। ও যদি বলে কলাপাতা তো তাই-ই সই। আমরা ধম্মো বই অধম্মো করে তো কিছু বলি না।

রাগে চীৎকার করে শেয়াল-সিংহী রাজা বলল—ঠিক আছে। এক কলাপাতা মুড়িই দোব। তোমরা দূর হয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।

পাড়ার লোকেরা মুখ টিপে হাসতে হাসতে শেয়াল-সিংহী রাজার বাড়ি থেকে চলে গেল। সবাই একে একে বলাবলি করতে লাগল—বেটা এবারে জব্দ হয়েছে। ঐ ফৎনা বেটাই বেটাকে এবার ন্যাদ্‌না পেটা করে ছাড়বে।

দুপুরে খাওয়ার সময় ফৎনা উঠোনে একটা বিরাট ঘোড়া পেতে বসল—কই গো মা-ঠাক্‌রোণ ভাত দাও। ঘোড়ার পাশে দুটো বিরাট বিরাট বাটি নামান।

শেয়াল-সিংহী রাজার মা যেই ঘোড়ার ভেতরে ফেন-ভাত ঢেলে দিয়েছে—অমনি ওমা! ঘোড়ার তলায় একটা ফুটো ছিল। সেই ফুটো দিয়ে সব ফেন বেরিয়ে গেল। তলায় মুঠো দুই ভাত পড়ে রইল। ফৎনা চীৎকার করে বলে উঠল—কি রকম ভদ্দরলোক তোমরা। চুক্তি করে কাজ করিয়ে, চুক্তিমত খেতে দাও না। আমার ঘোড়াভর্তি ভাত চাই-ই চাই।

কেলেঙ্কারীর ভয়ে, শেয়াল-সিংহী রাজার মা তাড়াতাড়ি এক হাঁড়ি ভাত ঢেলে দিয়ে বলল—এই নে খা। তারপর মুখ বেজার করে ফৎনার আনা বাটিতে একবাটি ডাল আর একবাটিতে তরকারী ঢেলে দিয়ে গেল। ফৎনা হাসতে হাসতে, যা খেতে পারল খেল। যা পারল না, তা আস্তাকুঁড়ে ঢেলে দিয়ে এল। রাজ্যের কুকুর এসে, কাক এসে, ভাত খাওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি ডাকাডাকি শুরু করে দিল। ও! সে এক কাণ্ড। মজা দেখতে বাড়ির দরজার সামনে ছোটখাট ভিড় জমে গেল।

রোজ এক কলাপাতা মুড়ি শুধু একজনকেই দিতে হচ্ছে। সে কি সোজা কথা। শেয়াল-সিংহী রাজার মাকে তাই রোজ 'খোলা-খোলা' মুড়ি ভাজতে হচ্ছে। মুড়ি ভাজার জন্যে কাঠও লাগছে অনেক। ফৎনাকে তাই রোজ সকালে বোঝা বোঝা কাঠ কাটতে হয়। কাঠ কেটে কেটে তার হাতে ফোস্কা পড়ে গেল। তাতে কষ্ট হলেও ফৎনার মনে একটুও দুঃখ নেই। বরং

শেয়াল-সিংহী রাজার মত ধড়িবাজ লোককে জব্দ করছে বলে সে মনে মনে বেজায় খুসী।

একদিন হয়েছে কি—রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে শেয়াল-সিংহী রাজার মা মুড়ি ভাজছে। ফৎনা এক বোঝা কাঠ মাথায় নিয়ে এসে বলল—কোথায় রাখবো মা ঠাকরুণ। আগুনের তাপে বসে মুড়ি ভাজতে ভাজতে শেয়াল-সিংহী রাজার মায়ের মেজাজটা বেশ 'তেতেই' ছিল। রেগেমেগে মুখ ভেংচে বলল—আমার মাথায়। অমনি ফৎনা কাঠের বোঝাটি ঝপাং করে শেয়াল-সিংহী রাজার মায়ের মাথায় ফেলে দিল।

বাপরে! মারে! কি আপদ কপালে জুটেছে রে বলে শেয়াল-সিংহী রাজার মা কাঁদতে লাগল। কাঠ পড়ে মুড়ির খোলা ভেঙ্গে চালগুলো উনুনের ভিতরে পড়ে গিয়ে 'চটাপট্ চটাপট্' শব্দ করতে করতে পুড়তে লাগল। কাঠের ঘায়ে শেয়াল-সিংহী রাজার মায়ের মাথা ফেটে রক্ত পড়তে লাগল। সে এক এলাহি কাণ্ড। শেয়াল-সিংহী রাজা তো তেড়ে গিয়ে ফৎনাকে এই মারে কি এই মারে। ফৎনা কিন্তু মোটেই ভয় খায়নি। হাসতে হাসতে বলল—আমি কি করব! কাগজে লেখা আছে যে যা বলবে, আমাকে তাই করতে হবে। আমাকে বলেছে মাথায় রাখ। আমি মাথায় রেখেছি।

কি আর বলবে শেয়াল-সিংহী। মনের রাগ মনে পুষে, মায়ের ফাটা মাথায় চুন লাগিয়ে দিল।

আর একদিন হয়েছে কি! শেয়াল-সিংহী রাজা শ্বশুরবাড়ি যাবে। তা ফৎনাকে সঙ্গে নিয়ে গেল। রাস্তায় ঠেসে চপ্‌ বেগ্‌নী ঘুঘ্‌নী খেয়ে পেট বেশ ভার ভার। তাই আগে থেকে ফৎনাকে বলল—ফৎনা তুই একটু পা চালিয়ে যা তো! গিয়ে বলবি—আমার জন্যে যেন পাতলা পাতলা মুসুরির ডাল, পুরোনো চালের ভাত, আর বড়িপোস্ত রান্না করতে। ফৎনা তো হন হন করে ছুটে চলেছে। শিয়াল-সিংহী রাজার অনেক আগে তার শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে গেল সে। গিয়েই বলল ওগো! তোমাদের জামাই আসছে। আমাকে আগে ভাগে পাঠিয়ে দিল। বেশ তেলালো ঝোলাল কালিয়া কোপ্তা পোলাও রেঁধে রাখতে বলেছে।

জামাই বলে কথা। তাতে আবার রান্নাবান্নার ফরমাস করে পাঠিয়েছে। শাশুড়ী তো হাঁকডাক করে জিনিসপত্র যোগাড় করে রান্নাবান্না করে রাখল। খেতে বসে শেয়াল-সিংহী রাজা অবাক। বলল—একি? আমার যে পেট গারাপ। শাশুড়ী পাখার বাতাস করতে করতে বলল—খাও বাবা! অনেক যত্ন করে তোমার জন্যে রেঁধেছি। কিছু হবেনি। খেয়েদেয়ে উঠে একটু নুন যোয়ান খেও বরং।

শেয়াল-সিংহী রাজা ছিল খুব পেটুক। লোভে লোভে চেটেপুটে সব খেয়ে নিল। খাওয়াদাওয়ার পর নুন জোয়ান, মিঠে পান খেয়ে শালী সেলেজদের সঙ্গে অনেকক্ষণ তামাসা-মস্করা করে শুতে গেল সে।

ঘরে শুয়ে আছে শেয়াল-সিংহী রাজা। বাইরের দাওয়ায় মাদুর পেতে ফৎনা শুয়ে আছে। একটা মশারিও খাটিয়ে দেয়নি কেউ। বাড়িতে ভীষণ মশা। মশার কামড়ে বেচারী কেবল বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করে। কখনও বা চটাস চটাস করে মশা মারে। ঘুম আর আসে না।

রাত তখন অনেক। হঠাৎ শেয়াল-সিংহী রাজা ঘরের ভেতর থেকে ডেকে বলল—ফৎনা! ঘুমিয়ে পড়েছিস নাকি।

এত রাতে ফৎনার জন্যে দরদ উথলে উঠল। কই, এতক্ষণ তো কিছু জিজ্ঞেস করনি চাঁদু। নিশ্চয়ই কোন ব্যাপার আছে। এইসব ভেবে, ফৎনা সাড়া দিল না। মটকা মেরে শুয়ে থাকে, মিছিমিছি নাক ডাকতে লাগল—ঘোঁরোৎ-ঘোঁ! ফোঁরোৎ-ফোঁৎ।

হঠাৎ ঘরের দরজা আস্তে আস্তে খুলে, পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এল শেয়াল-সিংহী রাজা। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে, ফৎনার দিকে একবার তাকিয়ে, পা টিপে টিপে দাওয়া থেকে নেমে, পা টিপে টিপে উঠানের কুয়োতলার দিকে এগুতে লাগল।

উঠোনে নামতেই ফৎনা সেদিকে তাকাল। একি শেয়াল-সিংহী রাজার পরনে গামছা। হাতে একটা কাপড়; পুঁটলি পাকানো। ব্যাপারটা কি আন্দাজ করে নিয়ে ফৎনার মাথায় একটা দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল।

একলাফে উঠোনে নেমে, শেয়াল-সিংহী রাজাকে জাপটে ধরে চোর-চোর বলে চেঁচিয়ে উঠল সে। যত সে চুপি চুপি বলে—ওরে আমি রে ফৎনা আমি! ছেড়ে দে। ততই সে চোর-চোর বলে চীৎকার করতে থাকে।

ফৎনার চীৎকারে বাড়ির সবাইকার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আর কেউ ঘরে শুয়ে থাকতে পারে। লাঠি-সোঁটা নিয়ে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আবছা অন্ধকারে দেখল কি—ফৎনা একজনকে জাপটে ধরে চোর চোর বলে চেচ্চাচ্ছে। ধরা চোর হাতের নাগালে পেলে কে আর পিটুনি দিতে ছাড়ে। সবাই তখন—মার বেটাকে। মেরে হাড় গুড়িয়ে দোব না বেটার! এইসব বলে আচ্ছা করে পিটুনি দিতে লাগল। লজ্জায় শেয়াল-সিংহী রাজার মুখে কোন কথা নেই। ততক্ষণে একজন আলো জ্বেলে নিয়ে এসে হাজির। আলোয় জামাইকে দেখে তখন বাড়ির সকলের মাথায় হাত। শেষকালে চোর ভেবে, জামাইকে ধরে ঠেঙানি দিল তারা। ছিঃ! ছি! কাঁদতে কাঁদতে শেয়াল-সিংহী রাজা বলল—এই ফৎনা বেটাই যত নষ্টের গোড়া। যত আমি বলছি, আমি রে আমি! বেটা তত বলছে—চোর চোর।

জিভ কেটে, হাত জোড় করে ফৎনা বলে, আমি বুঝতে পারিনি মশায়। তা অন্ধকারে, গামছা পরে হাতে পুটলি নিয়ে আপনি যাচ্ছিলেন কোথায়? বলে শেয়াল-সিংহী রাজার হাত থেকে পুঁটলিটি টেনে নিতেই সবাই নাকে কাপড় দিয়ে বলল—বাপ্‌রে কি গন্ধ।

ফৎনা তখন দুষ্টুমি করে বলে—এ্যা! আপনি সামলাতে না পেরে কাপড়ে-চোপড়ে পায়খানা করে ফেলেছেন বুঝি। তা আমি অত বুঝতে পারিনি মশায়।

শেয়াল-সিংহী রাজার মুখে কথাটি নেই। এতদিনে সে হাড়ে হাড়ে চিনে ফেলেছে ফৎনাকে। সে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল—তার শালী শেলেজেরা মুচকি মুচকি হাসছে। এখন ফৎনাকে কিছু বললে—সেও বেয়াদপি করে তার উত্তর দেবে। তাতে আরও হাসাহাসি করবে। তাই সে আর কিছু বলল না। পুকুরঘাটে গিয়ে কাপড়-চোপড় কেচে, ভিজে কাপড় ছেড়ে শুক্‌নো কাপড় পরে, বিছানায় শুয়ে পড়ল সে।

বাড়ি ফিরেই শেয়াল-সিংহী রাজা ফৎনাকে বলল—তোর মত কাজের লোকের দরকার নেই আমার। তুই আমার বাড়ি থেকে দূর হয়ে যা।

ফৎনা বলল—তা যাচ্ছি। তাহলে খাও পঞ্চাশ ঘা জুতো ; দাও পঞ্চাশ হাত নাক-খত ; আর দাও আমাকে পঞ্চাশটি টাকা। হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছি আমি। আর যদি আরও একশটি টাকা বেশী দাও তাহলে নাক-খত দিতে হবে না ; জুতোও খেতে হবে না।

কি আর করবে শেয়াল-সিংহী রাজা। গুনে গুনে দেড়শটি টাকা ফৎনার হাতে তুলে দিয়ে বলল—

রেহাই দে বাবা! তুই ফৎনা নয় রে। ন্যাদ্‌নাই বটিস্।

টাকা নিয়ে ফৎনা বাড়ি ফিরে গেল। বন্ধুকে সব কথা খুলে বলে, টাকাগুলো তার হাতে তুলে দিয়ে বলল—এবার তুই বাড়ি চলে যা।

যেমন বাদশা—তেমনি বেগম

এক যে ছিল বাদশা। তার নাম নাসির। বাদশার বেশ বয়েস হয়েছে। এক মুখ কাঁচা-পাকা সাদা দাড়ি। কিন্তু চোখ দুটি বেশ সুন্দর। দেখলে মনে হয়, কচি ছেলে।

তার যে ছিল বেগম। বেগম ভারী রূপসী। দুধে আল্‌তা গোলা রঙ। একমাথা ঘন কালো, লম্বা ঢেউ খেলান চুল। বাঁশীর মত টানা টানা দুটি চোখ। চাঁপার কলির মত দু'হাতের আঙ্গুলে। আর তেমনি কি মিষ্টি গলা। বেগম যখন কথা বলে—মনে হয় কে বুঝি তার বাজনায় সুর বাজাচ্ছে।

তা অমন যে বেগম। তার গায়ে কোন গয়না নেই। কানে হীরের দুল নেই। মাথায় সোনার মুকুট নেই।

পায়ে নেই নূপুর। গলায় নেই গজমোতির মালা। হাতে নেই সোনার কাঁকন। নাকে নেই চুনী বসানো



যেমন বাদশা—তেমনি বেগম

নাকছাবি। ওমা। কেমন বেগম। বেগম না বলে বাঁদী বললেই তো হয়।

তা বেগম বাঁদীই বটে। বেগমের পরণে সুতির পোশাক। বেগম নিজের হাতে কাপড় কাচে। বাসন মাজে। ঘর ঝাঁট দেয়। এমন কি রান্না করে। রান্না করে বাদশাকে খেতে দেয়। সাহজাদাকে খেতে দেয়। সাহজাদীকে খেতে দেয়। তারপর নিজে খায়।

সারা দিন কেবল খাটুনি আর খাটুনি। দিনে রাতে এতটুকু শুতে বসতে পায় না। আ-হা-রে! কি কষ্ট।

বাদশার যে টাকাকড়ি নেই তা নয়। বাদশা সোনার সিংহাসনে বসে দরবার করেন। দরবারে অনেক মন্ত্রী। অনেক সেনাপতি। অনেক লোক-লস্কর সৈন্য-সামন্ত হাতী ঘোড়া। তবু বেগমকে নিজের হাতে কাজ করতে হয়।

বাদশাও তা বলে চুপ করে বসে থাকে না। সারা দিন দরবার করে। দিনে রাতে পাঁচওয়াক্ত নেমাজ পড়ে। গরীব-দুঃখী সাধু-দুঃখীদের দান খয়রাত করে। আর রাতে পিদীমের আলোর তলায় বসে কালি-কলম দিয়ে কোরাণের পুঁথি লেখে। সেই পুঁথি বেচে যে টাকা-পয়সা পায়—তাতেই বাদশার, বেগমের, সাহজাদার, সাহজাদীর খাওয়াদাওয়া হয়।

তাহলে বাদশা অত টাকা নিয়ে কি করেন? সব টাকা বাদশা প্রজাদের মঙ্গলের জন্য খরচ করেন। বাদশা বলে—প্রজাদের দেওয়া খাজনা জমা করেই তো বাদশার এত টাকা। বাদশা কি মাটি খোঁড়ে, না চাষ করে, না লাঙ্গল পাজায়, না হাঁড়ি কলসী বানায়? এসব কাজ যারা করে, ও টাকা তাদেরই। তাদের দেখ—ভাল করার জন্য যারা খাটছে—ওই টাকা থেকেই তাদের মাইনে দেওয়া হয়। ও টাকা বাদশা নিলে তা গোনাহ হবে।

একদিন মন্ত্রী বলল—জঁহাপনা। আপনি তো সবকিছুর দেখ-ভাল করছেন। আপনি চারদিকে নজর রাখেন বলেই—আমরা সবাই সুখে আছি। শান্তিতে আছি। তার তো একটা মজুরী আছে। আপনি সে মজুরী নেবেন না কেন?

বাদশা বললেন—ইয়া খোদা! আমি তোমাদের মজুরী দিই। আমাকে কে মজুরী দেবে? তোমরা কি আমাকে মজুরী দিতে পার।

সেলাম করে মন্ত্রী বলল—গোস্তাকি মাফ করবেন জাঁহাপনা। তাই কি পারি।

বাদশা বলল—তবে? আমার মজুরী আল্লাতাল্লা দেবেন। তবে এখন নয়। আমার মজুরী এখন তাঁর হেফাজতে জমা থাকছে। রোজ কেয়ামতের দিন সুদে আসলে সব উশুল দেবেন তিনি। আমি নিজেই নিজের মজুরী নিলে, খোদা যে আমার ওপর গোঁসা করবেন। আই বাপ!

মন্ত্রী আর কিছু বলে না। ভাবে এমন বাদশাও এদেশের মাটিতে জন্মায়। বাদশা নিশ্চয়ই একজন নবী। আল্লাতাল্লাই তাঁকে পাঠিয়েছেন—গরীব বেরাদরদের দেখ-ভাল করার জন্যে।

তা একদিন হয়েছে কি! রাঁধতে রাঁধতে বেগমের হাত পুড়ে গেছে। আসল কথা কি, চাটু ধরার চিম্‌টে-সাঁড়াশি ভেঙ্গে গিয়েছিল। বেগম বলেছিল বাদশাকে—

একটা সাঁড়াশি কিনতে হবে। তা বদেশা বলল, যে-পুঁথিটা লিখছি সেটা বেচে সাঁড়াশি কিনব। দু'দিন হাতে কাপড় জড়িয়ে কাজ চালিয়ে নাও।

অত কি আর মনে থাকে। মনের ভুলে বেগম খালি হাতে গরম চাটু ধরেছে একদিন। অমনি হাত পুড়ে ইয়া বড় বড় ফোস্কা পড়ে গেল। উঃ! সে কি জ্বালা-যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় দুঃখে বেগম কেঁদেই ফেলল সেদিন।

খাওয়ার সময় বাদশা দেখল, বেগমের হাতে কাপড় জড়ানো। কি হয়েছে বেগম? বেশ আদর করেই জিজ্ঞেস করল বাদশা। বেগম কাঁদতে কাঁদতে হাত পুড়ে যাওয়ার কথা বলল। সব শুনে বাদশা শুধু বললেন—তাই তো।

কাঁদতে কাঁদতে বেগম বলল—জঁহাপনা। আমি তো নিজের হাতেই সব কাজ করি। তারজন্য আমার মনে রাগও নেই; দুঃখও নেই। কিন্তু এই পোড়া হাত নিয়ে আমি তো এখন বাসন মাজতে, কি রাঁধতে পারব না। ক'দিনের জন্য একজন দাসী রাখলে ভাল হত।

বাদশা বেগমের হাতটি নিজের হাতে নিয়ে বলল—তা আমিও বুঝি বেগম। কিন্তু দাসীকে মাইনে দোব কোথা থেকে। রাজকোষের টাকা তো আমার নয়। তা থেকে নিজের জন্য এক পয়সাও তো আমি খরচ করতে পারব না।

বেগম বলল—তা হলে উপায়। বাদশা বলল—আল্লার দোয়ায় উপায় কিছু একটা হবেই। না হয় আমিই কষ্টে-সৃষ্টে ঘর সংসারের কাজ করব।

তা শুনে বেগম হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে আকাশের দিকে দু'হাত তুলে আকুল হয়ে বলল—



আল্লার এই দান তুমি মাথা পেতে নাও নাসের

আল্লা মেহেরবান। তুমি কোথায়। দয়া কর। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

সঙ্গে সঙ্গে আকাশ আলো করে আল্লার দূত

জেব্রায়েল সেখানে নেমে এল। তার হাতে অক্ষয়-থালিকা। বলল—নাসের! তোমার কাজে-কর্মে, গরীবের উপর তোমার দয়া দেখে আল্লা খুব খুসী হয়েছেন। তোমার বেগমের ডাক তিনি শুনেছেন। আল্লার হুকুমে আমি আজ এখানে এসেছি। আমার হাত দিয়ে তোমাদের জন্য তিনি এই অক্ষয়-থালিকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। আল্লার এই দান তুমি মাথা পেতে নাও—নাসের। তুমি, তোমার বেগম, সাহজাদা, আর সাহজাদী—এই চারজনের দুবেলার আহার এই অক্ষয়-থালিকার কাছে চাওয়া মাত্র তোমরা রোজ পাবে। বেগমকে আজ থেকে রান্না করে খেতে হবে না। তবে বেগমের এন্‌তেকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অক্ষয়-থালিকা আবার ফিরে যাবে আল্লার কাছে। তোমার চাইতেও তোমার বেগমের ত্যাগ অনেক বেশী। আল্লার দোয়ায় তোমার বেগম অনেক গুণবতী। তুমি ধন্য নাসের। ধন্য তুমি।

নাসেরের হাতে অক্ষয়-থালিকা তুলে দিয়ে জেব্রাইল বেহেস্তে ফিরে গেল। তখন থেকে আর দু'বেলা রাঁধতে হত না। অক্ষয়-থালিকার কাছে চাওয়ামাত্র—দিনে রাতে তারা যা খেতে চাইত তাই-ই পেত।
